NATIONAL LIBRARY
CALCUTTA

বামাবোধিনী পত্রিকা।

Nos. 575-76. June & July, 1911.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৭৫-৭৬ সংখ্যা। | আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩১৮। | ৯ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিলাতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক—৭ই আষাঢ় ২২শে জুন বৃহস্পতিবার বিলাতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ১৭ই জুন স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসিনী রমণীগণ সুন্দর সমর-বেশে সুসজ্জিতা হইয়া এক বৃহৎ শোভা-যাত্রা করেন। এই শোভাযাত্রা ৭০টী বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। এ পর্য্যন্ত কোন অভিষেক-উৎসবে এরূপ শোভা-যাত্রা কখনও বাহির হয় নাই। ইহা ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অভিষেক উৎসবের আনন্দের মধ্যে আমরা নব সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। ভগবান্ ইঁহাদের রাজত্বকাল সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ করুন।

ব্রহ্মদেশীয় রমণীর কৃতিত্ব—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এম্, এস্, পরীক্ষায় শ্রীমতী মাথাস নাম্নী একটী ব্রহ্মরমণী উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশবাসিনী রমণীদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসাশাস্ত্রে উপাধি লাভ করিলেন।

বরোদার মহারাজকুমারীর বিবাহ—শুনা যাইতেছে বরোদার মহারাজ গাইকওয়ারের কন্যা, শ্রীমতী ইন্দিরার সহিত গোয়ালিয়রের মহারাজ সিন্ধিয়ার বিবাহ হইবে। গোয়ালিয়র মহারাজের স্ত্রী বর্ত্তমান আছেন। মহারাজ গাইক-ওয়ারের ন্যায় শিক্ষিত সমাজসংস্কারক যে এরূপ পাত্রে কন্যাদান করিবেন ইহা অতি দুঃখের বিষয়।

বিবাহ ও স্বাস্থ্য—বিবাহ সম্বন্ধে

যুক্তরাজ্যের ইণ্ডিয়ানা ষ্টেটে এই আইন হইয়াছে যে, কোনও ব্যক্তি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার বিবাহের উপযোগী স্বাস্থ্য আছে কিনা, তাহা উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া নিদর্শন-পত্র (সার্টিফিকেট) উপস্থিত করিতে হইবে।

সর্পবিষের অমোঘ ঔষধ—একজন পত্রলেখক ইংরাজী "এ্যাডভোকেট অফ ইণ্ডিয়া" নামক পত্রে লিখিয়াছেন—কেঁচোর শরীর হইতে যে এক প্রকার উজ্জ্বল রস বাহির হইয়া থাকে, সেই রস সর্পবিষের অব্যর্থ ঔষধ। এই রস জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক ঘণ্টা অন্তর তিন চারি বার সেবন করিতে হয়। ইহাতে প্লেগও আরাম হয়। সকলেরই এই ঔষধ পরীক্ষা করা উচিত।

বৃষ্টির অভাব—এ বৎসর সর্ব্বত্রই বৃষ্টির অভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষের ১৭০ স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গণনা করা হয়। তন্মধ্যে ১১৮ স্থান হইতে বৃষ্টির অল্পতার সংবাদ আসিয়াছে। বৃষ্টির অভাবে এ বৎসর সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে।

দেহত্যাগ—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ১৬ই আষাঢ় শনিবার রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর মহাশয় রক্তামাশায় রোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সেন মহাশয় প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ইণ্ডিয়ান মিরার নামক সম্বাদপত্রের সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন। দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধনে তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার দেহ-ত্যাগে বঙ্গের সর্ব্ব শ্রেণীর লোক যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের অন্তরে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

সুবর্ণ মূর্ত্তি—পঞ্জাবে ভূগর্ভ খনন করিতে করিতে ভারত গভর্ণমেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের একজন কর্ম্মচারী একটি স্বর্ণমূর্ত্তি পাইয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিৎদিগকে প্রদর্শন করিবার জন্য তাহা শীঘ্রই কলিকাতায় প্রেরিত হইবে। এইরূপে প্রাচীন শিল্পের পুনরাবিষ্কার হইলে অনেক পৌরাণিক কাহিনী জানিতে পারা যাইবে ও তদ্দ্বারা জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, আশা করা যায়।

উৎসব মেলা—ভারত সম্রাট্‌ ও সম্রাজ্ঞীর ভারতে শুভাগমন উপলক্ষে বোম্বাই নগরের রাজভক্ত অধিবাসিগণ আগামী নবেম্বর মাসে একটি মেলার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। বোম্বায়ের মাঠে এই উৎসব-মেলা বসিবে। সম্রাট্ যুবরাজরূপে যখন বোম্বাই আসিয়াছিলেন, তখনও ঐরূপ মেলা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের বালিকাগণ ইংরাজী, গুজরাটী এবং মারাট্টী, এই তিন ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত করিয়া যুবরাজের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या বামাবোধিনী পত্রিকা
Class No. আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩১৮
पुस्तक संख्या
Book No. জুন - জুলাই - ১৯১১

रा० पु०/N. L. 38. ৪৮ - বর্ষ, ৪র্থ ভাগ

H7/Dte/NL/Cal/79—2,50,000—1-3-82—GIPG.

নূতন ডাকটিকিট—সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের পর হইতে তাঁহার মুখাঙ্কিত টিকিট প্রচলনের ব্যবস্থা হইতেছে।

চরিত্রবল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সন্তানদিগকে ভোগ বাসনার অনুবর্ত্তী করিয়া অনেকে মনে করেন তাঁহারা স্ব স্ব সন্তানদিগের সুখের পথ পরিষ্কৃত করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক বালকবালিকাগণ বাল্যাবধি ভোগ বাসনার দাস হইয়া পরিশেষে তজ্জন্য অশেষ কষ্ট পাইয়া থাকে। দেবত্ব ও পশুত্ব এই দ্বিবিধ ভাব মানবহৃদয়ে যমজ ভ্রাতৃস্বরূপ। বাহেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সাধন অর্থাৎ আহার বিহারের অদম্য পিপাসা, ক্ষণস্থায়ী পাপমূলক কার্য্যে আসক্তি প্রভৃতি দ্বারাই পশুত্বের লক্ষণ প্রকটিত হয়। আর বিশুদ্ধ অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তদ্দ্বারাই দেবভাব সূচিত হয়। সন্তানসন্ততিদিগের প্রতি স্নেহমমতা, উপযুক্ত পাত্রে প্রাণের ভালবাসা, আতুরে দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি দেবত্বের লক্ষণ। মানুষ যে দেবত্ব ও পশুত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা তাহারা বাল্যকালে পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্যান্য গুরুজনের প্রদত্ত সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা দ্বারা, এবং যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে আপনার অনুষ্ঠিত ক্রিয়া দ্বারা ক্ষয় বা বৃদ্ধি করিতে পারে। এই দুই ভাবই বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট বলিয়া তাহাদের একের বৃদ্ধি বা হ্রাসে অপরের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তাহার স্বাভাবিক দেবত্বের বিকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার দেবভাব ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পশুভাবকে দমন করে এবং তিনিই মনুষ্যসমাজে একজন পূজনীয় ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। আর যিনি পশুত্বের সেবা করেন, তিনি কালে আপনাকে নরাকারে দ্বিপদ পশু বলিয়াই জনসমাজে পরিচিত করিয়া তুলেন। পশুভাবমূলক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে তাঁহার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক দেবভাব বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়। বড়ই ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় যে, আজকাল অনেক পিতা মাতা বা অভিভাবক তাঁহাদিগের শাসনাধীন বালকবালিকাদিগের পশুত্ব বৃদ্ধি করিবারই চেষ্টা করেন। তাঁহারা যে সন্তানসন্ততিগণের অমঙ্গলকামনায় এরূপ করিয়া থাকেন তাহা কখনই নহে। তবে কথা এই যে, তাঁহারা ঈদৃশ পশুভাবব্যঞ্জক ক্রিয়ার শোচনীয় পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা সন্তানদিগকে যে প্রণালীতে লালন পালন করেন, সেই

প্রণালীতে লালিত পালিত হওয়ায় অনেক সন্তানেরই পরকাল নষ্ট হয়, এরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ যে তাঁহারা দেখিতে পান না এমন নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা স্বয়ং ভোগলালসার সেবক বলিয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। আর তাঁহাদের দেবত্বের উৎকর্ষমূলক শিক্ষা দান করিবার শক্তি থাকে না। ভোগ-বাসনাসর্ব্বস্ব দম্পতী যতই বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে থাকেন, ততই তাঁহাদের বিলাসস্পৃহা বলবতী হয়। এই অবস্থায় যাহাদের সম্পত্তি থাকে, তাহারা ত একরূপে কাটাইয়া যায়, কিন্তু যাহারা নিঃস্ব তাহাদের কষ্টের অবধি থাকে না।

স্বামী ও স্ত্রীর নানা বেশভূষায় ক্রমে যত অর্থনাশ হইতে থাকে, ততই তাঁহারা ঋণের দায়ে বিব্রত হন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তথাপি তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হয় না। এরূপ অবস্থায় কোনরূপ হিতাহিত-জ্ঞান সঞ্চার হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা যেন আরও কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আপনাদিগের বিলাসিতামূলক ক্রিয়ার দুর্জ্জয় তৃষ্ণার তাড়না অনুভব করিয়া এক প্রকার অবজ্ঞেয় সুখ উপভোগ করিতে থাকেন। আর যাঁহাদের পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি থাকে অথবা স্বকীয় সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহারা কোন প্রকারে ঈদৃশ অশান্তিময় তুচ্ছ সুখেই জীবনযাপন করেন। যুবকযুবতীগণ আপনাদিগকে বিলাসের দাসদাসীর পদে প্রতিষ্ঠিত করতঃ অকিঞ্চিৎকর সুখ অনুভব করিতে করিতেই আর একটা নূতন সুখের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করে। তাহারা বিলাস-তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিয়া মনে করে আহা! এ সময় যদি তাহাদের একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে সেও তাহা-দের সেই সুখের ভাগী হইত। তাহাদের নিজের বিলাসতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হউক আর নাই হউক, তথাপি তাহারা সর্ব্বদাই একটী সন্তানের কামনা করিয়া সেই ভাবী সন্তানকেও যাবতীয় বিলাসের সুখে সুখী করিবে বলিয়া এক দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করে। কালক্রমে বড় সাধের সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামাতার আর আনন্দের সীমা থাকে না। পিতা মাতা তখন অল্পাধিক পরিমাণে আত্মসুখ বিস্মৃত হইয়া সেই সন্তানের সুখ স্বচ্ছন্দ-তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। কি মহারাজা, কি রাজা, কি জমিদার, কি মহাজন, কি হাকিম, কি কেরাণী, কি মুহুরী, কি ভৃত্য অনেকের মধ্যেই সন্তানকে ভোগবাসনার সহচর করিবার এই দুর্জ্জয় স্পৃহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সন্তানসন্ততিদিগকে এইরূপ ভোগী বা বিলাসী করিলে তাহার ভবিষ্যজীবন যে কিরূপ অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে, তাহা প্রায় অনেকেই বুঝিতে পারে না।

(১০)

এ স্থানে বক্তব্য এই যে, অনেক সন্তান জন্মাবধি ভোগবিলাসের মধ্যে প্রতি-পালিত হইয়াও সম্পূর্ণভাবে যে মনুষ্যত্বের

লক্ষণ দেখাইতে সক্ষম হইয়া থাকে, তাহার বিশেষ কারণ আছে। এই সকল সন্তানের পিতামাতা বা অভিভাবক তাহাদিগকে বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াও তাহাদিগের প্রকৃত ভাবী সুখের জন্য চেষ্টা করিতে বিরত হন না। এই সকল মহাত্মা সন্তানদিগের বাহিরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যে পরিমাণে চেষ্টা করেন, তাহাদিগের দেবভাব বিকাশের জন্য তদপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারাই সন্তানদিগের প্রকৃত শিক্ষক এবং ইঁহারাই "দোষ দেখে রুষ্টভাব তুষ্ট গুণ দেখে" বাক্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করেন। আজ কাল অনেক স্থলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে এমন বেশবিন্যাসে সাজান হইয়া থাকে যে, তাহারা পঞ্চদশ মুদ্রা উপার্জ্জনকারী বাবুর অথবা পঞ্চ মুদ্রা বেতনের ভৃত্যের পুত্রকন্যা হইলেও তাহাদিগকে রাজকুমার বা রাজকুমারী বলিয়া ভ্রম হয়। এই দৃষ্টান্তে কোন কোন ভৃত্য বা দাসী আপনার ছেলেটীকে স্বকীয় মনিবের ছেলের ন্যায় সাজাইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় আপনার দুই, তিন কি চারি মাসের কষ্টার্জ্জিত বেতনের টাকা ব্যয় করিয়া অর্থাভাবে কষ্ট পায়।

(১১)

শারদীয় পূজার সময় এইরূপ ঘটনা এ দেশে শত শত দৃষ্ট হইয়া থাকে। সন্তানদিগের এইরূপ বেশবিন্যাস ও মূল্যবান্ আহারাদির ব্যবস্থা করিতে গিয়া আজকাল অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত হয়। রাজা, মহারাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের অর্থনাশক বিবিধ কর্ত্তব্য আছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ অর্থ স্ব স্ব বংশের যাবতীয় জনের বিবিধ বিলাসবাসনার পরিতৃপ্তি নিবন্ধন ব্যয় হয়। আজ কাল অনেক রাজসংসার এই সকল কারণে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের হৃদয়ে উল্লিখিতরূপে বিলাসের যে বীজ উপ্ত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা কালে কেবল বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই বিলাসের দায়ে কেহ কেহ পিতৃ পিতামহের কষ্টসঞ্চিত বিষয় সম্পত্তি হারাইয়া হাহাকার করিতেছেন, কেহ কেহ স্বকীয় বংশগত বহুলাভজনক ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিতেছেন, কেহ কেহ স্বোপার্জ্জিত বহু ধন বিসর্জ্জন দিয়া শেষ দশায় অশ্রুজলে বুক ভাসাইতেছেন, কেহ কেহবা ভাবনা চিন্তায় মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত হইয়া কত কষ্ট ভোগ করিতেছেন। কেহ কেহবা সংসারের আত্যন্তিক ব্যয় যোগাইতে না পারিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন। হাকিমবাবু বৃদ্ধ পিতামাতা, সহায়সম্পত্তিহীন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় স্ত্রী-পুত্রের বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন বলিয়া যে আশা করিয়াছিলেন, তাহাও বিলাসজনিত ব্যয়বাহুল্যে ক্রমে নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। এস্থানে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক দেখা

উচিত। বিলাসের সংস্পর্শেই গেলে বা আত্মীয় স্বজনকে তাহার সুখানুভব করিতে দিলেই যে মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষা ঘটে এমন নহে। বিলাসবাসনা মনুষ্যের প্রকৃতিগত পশুভাবব্যঞ্জক ধর্ম্ম। এই পশুভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব নামক আর একটি ভাব আছে, তাহার পুষ্টি-সাধনকল্পে আদৌ কোনরূপ যত্ন করা হয় না বলিয়াই কেবল পশুত্বেরই আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া থাকে। যে বাল্যকাল শিক্ষার প্রশস্ত সময়, তখন অনেক স্থলে কেবল পশুভাবগুলিই পুষ্ট হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে পরিণামে যে বিষময় ফল ফলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বহুমূল্য বসন ভূষণ ও বাসনার তৃপ্তিকর আহারাদি দিয়া সন্তান-দিগকে লালন পালন করিবার সময়ই তাহারা বিকৃতভাবাপন্ন হইতে থাকে। তখন হইতেই তাহাদের এই বিষম রোগের সূত্রপাত হয়। অতএব যে পরিমাণে তাহাদের পশুত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহাদের দেবত্বের সংপ্রসারণকল্পে যত্ন হইতেছে কি না তাহা বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, অতি অল্প লোকেই এই হিতকর নীতির অনুসরণ করিয়া থাকে এবং এই নীতির অনুসরণের অভাবেই আজ সুখ-ময় সংসার কেবল দুঃখেরই আগার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন যেন প্রায় প্রতি গৃহেই সেকালের সেই শান্তি নাই, সেই শান্ত শিষ্ট বালক বালিকা নাই, লক্ষ্মী-স্বরূপা গৃহিণী নাই। কেবল চারি দিকেই অসন্তোষ, নৈরাশ্য ও দুর্জ্জয় ভোগবাসনা অশান্তিকে সহচরী করিয়া প্রতি গৃহেই বিরাজমান। এইরূপে অপরিণামদর্শী অভিভাবকের অভিভাবকত্বে লালিত পালিত হইয়া বালকবালিকাদিগের শিক্ষার উপযোগী বাল্যকাল কাটিয়া যায়। এই সময়েই যে বালকবালিকাগণ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া উঠে, তাহা একটু পরীক্ষা করিলেই বলিতে পারা যায়। তবে এই অবস্থা হইতে তাহাদিগের যে উদ্ধার সাধন অসম্ভব তাহা নহে। এই সময় বালকবালিকাদিগের বয়স সাত, আট কি দশ বৎসরের অধিক হয় না। দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতে দেওয়া হয়। বালিকাদিগের মধ্যে অনেকে ইতিপূর্ব্বেও বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং তথায় কিছু কিছু বিদ্যালাভ করিয়া ১০।১২ বৎসরের মধ্যে বিবাহিতা হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বালকবালিকাগণ আপনাদিগের অভি-ভাবকদিগের শিক্ষামাহাত্ম্যে যে বিষবৃক্ষের বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে ধারণ করিয়া যথাক্রমে বিদ্যালয়ে বা শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করে, তাহা বালকের পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও বালিকাদিগের পক্ষে তাহাদিগের শ্বশুর শাশুড়ী বা উপযুক্ত স্বামী প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। শিক্ষার এই সন্ধিস্থান বড়ই ভয়ানক। এই সময় তাহাদিগের প্রতি উপযুক্ত ও তত্ত্বজ্ঞ শিক্ষক বা বহুদর্শিনী

গৃহিণী ও শিক্ষয়িত্রীর দিব্যজ্ঞানমূলক দৃষ্টি বা মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। উচ্ছৃঙ্খল বালকবালিকাগণ বিলাসের স্রোতে হাবুডুবু খাইয়া ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বাসনার তৃপ্তি সাধনে যেরূপে বা যে পরিমাণে বিকৃত হয়, তাহা এই সময় অভিভাবকদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত এবং বিশেষ যত্নসহকারে ও ধীরতার সহিত বালকবালিকাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে যে বীজ রোপিত হইয়াছে, তাহা কৌশলক্রমে উৎপাটিত করিয়া উপযুক্ত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষাবিধানকল্পে যত্ন করা উচিত।

(১২)

বলা বাহুল্য, এই সময় কিঞ্চিৎ কঠোরতা অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। কিন্তু সাবধান যেন এই সময়েও শিক্ষাদান করিতে গিয়া তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী অপরিণামদর্শী অভিভাবকের ন্যায় হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রদর্শিত না হয়। এই সন্ধিস্থলে কোনরূপ কাপুরুষতা দৃষ্ট হইলে সন্তানসন্ততিগণের ভাবী মঙ্গলের আর কোনরূপ আশাই থাকিবে না। এই সময় বালিকাদিগকে কেবল আদরের চক্ষে না দেখিয়া তাহাদিগকে আদর ও কঠোরতা বিমিশ্রিত শাসনের অধীনে রাখিতে হয়। সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, শুদ্ধ আদরে বা কেবল কঠোর শাসনে কাহাকেও আয়ত্তাধীনে রাখা যায় না। কেবল আদর করিলে সন্তানের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, তাহা অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আবার ইহাও বলা আবশ্যক যে, কাহারও প্রতি কেবল কঠোর ব্যবহার করিলে তাহাতে মঙ্গল সাধিত হয় না। তাহাতে তাহাদের শারীরিক শাসন হইতে পারে বটে, কিন্তু আদর ও কঠোর শাসনের বিমিশ্রণ না হইলে কাহারও চিত্ত হরণ করা যায় না। এই চিত্তহরণক্রিয়া সমাপিত না হইলে শাসিত ব্যক্তির শাসকের প্রতি অনুরাগ জন্মে না এবং অনুরাগ না জন্মিলে শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বালকের পঠদ্দশা ও বালিকার গার্হস্থ্য জীবনের প্রারম্ভ চরিত্রবল শিক্ষার যোগ্য কাল বলিয়া বোধ হয়। এই সময় বালকবালিকার যাহাতে মানসিক তেজ প্রবল হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিবিধ শিক্ষা প্রদান করা বিধেয়। এই সময় যাহা ভাল তাহার উপকারিতা ও যাহা মন্দ তাহার অপকারিতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত এবং বালকবালিকাগণ কার্য্যক্ষেত্রে যাহা অসৎ তাহা পরিত্যাগ করতঃ যাহা সৎ তাহার অনুসরণ করিতেছে কি না তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টির আবশ্যক। যাহার সৎকার্য্যে মতি হইবে, তাহার প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিতে হইবে, আর যাহার অসৎকার্য্যে আসক্তি দৃষ্ট হইবে তাহাকে কঠোর শাসনে শাসিত করিয়া যতক্ষণ না সৎকার্য্যে অনুরাগ প্রদর্শন করিবে ততক্ষণ তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে বালিকা শ্বশুরালয়ে থাকিবে, তাহাকে সৎকার্য্যানুরাগিণী করিবার জন্য কঠোরতা অবলম্বন করিতে গেলে হয়ত

নানারূপ বাধা ও বিঘ্ন উপস্থিত হইতে না পারে, কিন্তু বিদ্যালয়ে এইরূপ কঠোর নীতির প্রচারে অনেক সময় নানারূপ অহিতকর ঘটনার অবতারণা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন—এমন কি কোন কোন অভিভাবক হয়ত বিলাসী সন্তান কঠোরতা সহ করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া পূর্ব্ববৎ আদর করিতে করিতে তাহার পরকাল নষ্ট করিয়া থাকেন। এরূপ ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের বহুবিধ যত্নও ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং সেই উচ্ছৃঙ্খল বালকের সংসর্গে অন্যান্য বালকেরও অনিষ্ট হয়। এইরূপ বিকৃত-মস্তিষ্ক অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণের চিত্তবিকার বিদূরিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

১৯১১ সালের ২২শে জুন লণ্ডন-নগরে সম্রাট ৫ম জর্জ্জের অভিষেক উপলক্ষে।

(১)

সুদূর পশ্চিমে ওই সাগরমাঝার,
দেখ দেখি মানচিত্রে বসতি কাহার?
লোহিত রঙ্গেতে আঁকা, দেশ তার যায় দেখা,
ক্ষুদ্র দ্বীপ বটে তার প্রতাপ প্রবল,
ইঙ্গিতে শাসিছে দেখ অবনীমণ্ডল।

(২)

বারিধি-বেষ্টিত ওই সুন্দর নগর,
সৌধ-কিরীটিনী-লঙ্কা জিনি মনোহর,
পোত-রাজি চারি ধারে, ঘেরিয়া রেখেছে তারে,
বাণিজ্যে হয়েছে লক্ষ্মী অচলা তাহার,
হেন স্থান রাজধানী বল দেখি কার?

(৩)

চারি দিকে কার্য্যস্রোত অবিরামগতি,
আলস্যের অধিকার নাই এক রতি;
সজীব মানব হেথা, হৃদে কারো নাই ব্যথা,
প্রফুল্ল-আনন সবে কর্ম্ম লাগি ধায়,
উন্নতি খুঁজিয়া সদা ফিরে বসুধায়।

(৪)

বিদ্যা বুদ্ধি কিছু নাহি এদের অভাব,
অসম সাহসী এরা বীরের স্বভাব;
রণরঙ্গে মাতে যবে, অরাতি ডরায় তবে,
সদর্পে তাহারে শীঘ্র করে পরাজয়,
বসুধা কম্পিত প্রাণে করে তারে ভয়।

(৫)

উন্নত ইংরাজ জাতি সভ্যতা-সোপানে,
বিদিত ধরার মাঝে ধনে, মানে, জ্ঞানে,
নিয়মের বশ সবে, একতা বৈভব ভবে,
সময়ের মূল্য এরা বুঝে ভাল করে,
বল হেন কোন্ জাতি অবনী উপরে ?

(৬)

এই রাজ্য সমুজ্জ্বল স্বাধীনতা ধনে,
অর্থ সুখ ভবে যাহা জীবের জীবনে,
হেথা লোক সমুদায়, সাম্যগীত সদা গায়,
নারার উন্নত দশা হেরিবে হেথায়,
বল দেখি কোন্ রাজ্য এমন ধরায় ?

(৭)

উন্নত বৃটীস জাতি দ্বীপমাঝে বাস,
বৃটেন এদের দেশ আছে বার মাস,
আইনের বাধ্য সবে, প্রতিকূল নাহি হবে,
পার্লেমেণ্ট মহাসভা আছে যে হেথায়,
দেশের সকল কাজ মীমাংসিত তায়।

(৮)

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগর,
কেন আজ সুসজ্জিত এমন সুন্দর ?
কেন রে কামানধ্বনি, মুহুর্মুহু কাণে শুনি,
গরজি গভীর ঘন প্রতিধ্বনি করে ?
কি শুভ ঘটনা আজ লণ্ডন নগরে ?

(৯)

কি শুভ ঘটনা আজ বৃটেন ভিতরে,
চারি দিকে মহোৎসব কেন আজি করে ?
গীত বাদ্য সদা হয়, সকলে আনন্দময়,
আনন্দ-উৎসবে সবে হয় নিমগন,
বিলাত আনন্দময় আনন্দ-ভবন !

(১০)

আজিকে যে অভিষেক হবেরে রাজার,
তাই এই আয়োজন এ মহাব্যাপার,
চারি দিক হ'তে আসে, বৃটন বিলাত-
বাসে,
ফরাসি, জর্ম্মাণ জাতি, অষ্ট্রীয়া, রুসিয়া,
তুরস্ক, মার্কিন আসে আনন্দে মাতিয়া।

(১১)

দক্ষিণ আফ্রিকা হতে আসে যাত্রিগণ,
সবার বাসনা মনে রাজদরশন,
পারস, ভারত আসে, লণ্ডন-নগর-বাসে,
তিব্বত তাতার চীন মিসর জাপান,
সবে মিলে আসে কেহ বাদ নাহি যান।

(১২)

সম্রাট্ জর্জ্জের আজি অভিষেক হবে,
তাই দেখি হেথা সবে উন্মত্ত উৎসবে,
তাই আজ প্রতি জনে অভিষেক-
আলাপনে,
ঈশ্বরের কাছে বর রাজার কারণ,
হৃদয় খুলিয়া আজি চাহে সর্ব্বজন।

(১৩)

উত্তম উৎসাহে পূর্ণ লণ্ডন নগর,
আনন্দ-তরঙ্গ তায় ছুটে নিরন্তর,
রাজা রাণী হেরিবারে সর্ব্ব জন ধায়,
কেহ বা পশ্চাতে রহে কেহ অগ্রে যায়,
ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি সবে ব্যস্ত তায়।

(১৩)

নিমন্ত্রিত রাজা যত পায় সমাদর,
পোষাকের চাকচিক্যে উজ্জ্বল নগর,
এ দেখে উহার গায়, সকলে জিনিতে
চায়,

যার যে রতন ছিল দেখায় সকলে,
ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ মরি কি ভূতলে।

(১৫)

কোথায় অলকাপুরী কুবেরনগর,
কোথায় উন্নতশির লণ্ডন নগর ?
হেন ধুমধাম আর, হবে কি জগতে কার,
হেন বেশভূষা করি শোভিছে ভূতলে,
অতুল লণ্ডন আজ এ মহীমণ্ডলে।

(১৬)

আনন্দের রোল উঠে গগন ভেদিয়া,
বৃটিশ বাজনা বাজে থাকিয়া থাকিয়া,
জয় সম্রাটের জয়, জয় বৃটেনের জয়,
গায় যে বৃটনবাসী উল্লাসে মগন,
উৎসবের বৈজয়ন্তী উড়ায় পবন।

(১৭)

ওই দেখ ওই খুলে স্বর্গের তোরণ,
দেবগণ ওই করে পুষ্প বরিষণ,
কিন্নর কিন্নরী গায়, দিব্য দূত তান দেয়,
আনন্দপ্রবাহ ছুটে স্বর্গের ভিতরে,
দেবগণে হৃষ্টমনে পুষ্পবৃষ্টি করে।

(১৮)

থাকহ সুখেতে তুমি থাক হে রাজন্,
ন্যায়বান্ হয়ে প্রজা করহ পালন,
দয়ার আধার হয়ে, প্রজাগণে কোলে লয়ে
শাসন করহ তুমি ভারত তোমার,
এই আশা ধরি মোরা হৃদে অনিবার।

(১৯)

"তব রাজ্যে শান্তি যেন থাকে সর্ব্বক্ষণ,
দুঃখলেশ প্রজা যেন না পায় কখন ;
হেরিয়া তাদের সুখ, আনন্দে ভরিবে বুক,
সুখেতে যাইবে দিন, রাজন্ তোমারি,
দীর্ঘায়ু হইবে তুমি অবনী উপরি।"

(২০)

এই বলি চলি গেলা কোথা দেবগণ,
আবার আবদ্ধ হ'ল স্বর্গের তোরণ,
চারি দিকে জয়ধ্বনি, ঘন ঘন কাণে শুনি,
জয় সম্রাটের জয় গাইল সকলে,
জয় বৃটনের জয় অবনীমণ্ডলে।

(২১)

পরাও ফুলের মালা সম্রাটের গলে,
কোথা হে নগরবাসী শীঘ্র এস চলে,
ভক্তি শ্রদ্ধা লয়ে সবে, সম্রাটে পূজিতে হবে,
ইহার অন্যথা যেন না হয় কখন,
ভারত রাজারে জানে দেবতা যেমন।

(২২)

ভারত মঙ্গল তব চাহে হে রাজন্,
তব পিতামহী তাঁরে করিত যতন,
প্রাচীনা স্থবিরা অতি, রেখো দৃষ্টি তাঁর প্রতি,
মঙ্গল কামনা তিনি করেন সদাই,
সুস্থ থাক চিরদিন না থাকে বালাই।

(২৩)

ভারতের মুখ পানে কেবা আর চায়,
তুমিই সর্ব্বস্ব আজ তাহার ধরায়,
তব ভাল মন্দ যাহা, তাহার জানিবে তাহা,
তাই সে যে সদা চায় তোমার মঙ্গল,
তুমিই তাহার রাজা তাহার সকল।

(২৪)

গাওরে ভারতবাসী গাওরে এখন
জয় সম্রাটের জয় ধর্ম্মের নন্দন,

জয় বৃটেনের জয়, ভারতও গায় জয়,
জয়গান সর্ব্বমুখে ভারত ভবনে,
রাজভক্ত হিন্দুগণ জানে সর্ব্বজনে।

(২৫)

আবার বাজনা বাজে থাকিয়া থাকিয়া,
আনন্দ লহরী ছুটে গগন ভেদিয়া,
কোমল অধরে হাসি, বিদ্যুল্লতা পরকাশি,
বরাঙ্গী রমণী কত চলে দলে দলে,
বিলাতের মহোৎসব অতুল ভূতলে।

(২৬)

আবার নাদিল ওই ভীষণ কামান,
বৃটেনের ধুমধাম দিতেছে জানান,
আবার পবন ভরে, জগতে প্রচার করে,
গর্ব্বিত নিশান ওই আকাশে থাকিয়া,
বৃটেনের বলবীর্য্য জগত যুড়িয়া।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

দুইটি বন্ধু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পাঠিকা ভগ্নীগণ উল্লিখিত যুবকদ্বয়ের অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের আরও একটু বিশেষরূপ পরিচয়ের আবশ্যক হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্রের পিতার নাম নবীনচন্দ্র বসু। হুগলী জেলার অন্তর্গত, পলাশপুরে তাঁহার নিবাস ছিল, যে কারণে তিনি বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তিনি সপরিবারে বর্দ্ধমানে অবস্থান করিতেছেন। বর্দ্ধমানে দেওয়ানি আদালতে তিনি মহাফেজ। যাহা উপার্জ্জন করেন, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। এখন তাঁহার এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র সুরেশচন্দ্রের পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। এজন্য পুত্রকে চাকুরির নিমিত্ত কোনও আফিসে ভর্ত্তি করিবেন মনঃস্থ করিলেন। সুরেশচন্দ্রের বয়স এখন সপ্তদশ বৎসর মাত্র! নবীন যুবক বলিলেও বলা যায়, বালক বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাঁহার সেই কোমল প্রাণে তখন কত আশা, কত উদ্যম, কত উৎসাহ! তিনি দেখিলেন যদি ইহারই মধ্যে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে উন্নতির সকল আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে। তিনি মনে মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে ভাবিলেন "কলিকাতা মহানগরী ভারতের রাজধানী, এক বার সেইখানে গিয়া দেখিব যদি পড়িবার কোনও সুবিধা করিতে পারি।" বলা বাহুল্য, সুরেশ ইতিপূর্ব্বে আর

কখনও কলিকাতায় আসেন নাই। যদি অদৃষ্ট দেবী সুপ্রসন্ন হয়েন, এই আশায় তিনি নিজ মনোভাব পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন।

নবীন বাবু পুত্রের এই প্রকার পাঠের আগ্রহাতিশয্যদর্শনে নিজ অদৃষ্টের বিষয় স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,"বাবা, তুমি আমার একমাত্র পুত্র, কুলের গৌরব, তোমার উপর আমি কত আশা ও নির্ভর করিতাম, কিন্তু হায়! আমার দুরদৃষ্টের জন্যই তোমাকে নবীন বয়সে বিদ্যালয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছি। কি করিব, উপায় নাই। তুমি যদি কোনও প্রকারে তোমার পাঠের সুবিধা করিয়া লইতে পার, তাহাতে আমার আনন্দ ভিন্ন অমত কি হইতে পারে?"

পিতার মুখে এই কথা শুনিয়া সুরেশের আহ্লাদের সীমা পরিসীমা রহিল না। হৃষ্টচিত্তে পিতা মাতার চরণধূলি মস্তকে লইয়া শুভ দিন দেখিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে তিনি কত কি যে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

প্রথম চিন্তা—গিয়া দাঁড়াইবেন কোথা? নূতন স্থানে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাবে কাহার নিকট যাইবেন? কোথায় বা আশ্রয় পাইবেন? কলিকাতায় কোন আত্মীয় বন্ধু নাই। উহা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্থান।

এরূপ অবস্থায় তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, এই চিন্তাই তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়তঃ যে আশায় তিনি কলিকাতা যাইতেছেন তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইবে কি? আর কে তাহা জানে ভগবানই জানেন। সুরেশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন্! তুমি আমায় সহায় হও।" মানুষ ভাবিয়া, ভাবিয়া, যখন ভাবনার কূল না পায়, তখন ভগবানের চরণে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। বিপৎকালেই মানুষ ভগবান্‌কে অধিক স্মরণ করে, সম্পদের সময় সেরূপ করে না। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, কুন্তী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন "হে ভগবন্! বিপৎকালেই যদি তোমাকে দেখিতে পাই, তবে আমি নিরত সেই বিপদের কামনা করি। সম্পৎকালে যদি তোমার সাক্ষাৎ না পাই, তবে আমি সেরূপ সম্পদ প্রার্থনা করি না।"

কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণে নির্ভর করিয়া কোনও কার্য্য করিলে এক দিন নিশ্চয় তাহার সুফল ফলিবেই ফলিবে।

সুরেশচন্দ্র যখন কলিকাতায় যান, তখন ট্রেণে কলিকাতার একটী যুবকের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। যুবকটী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ভূপেন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান বলিয়া একটু বিলাসপ্রিয় ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে অপর কোনও দোষ ছিল না। অনেক ধনীর পুত্র যেমন অহঙ্কারে

"ধরাকে" "সরা" জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রকৃতি আদৌ সেরূপ ছিল না। তাঁহার যে সকল সদ্‌গুণ ছিল, তাহা এই স্বার্থপর সংসারে অতি বিরল। সুরেশের সহিত আলাপ করিয়া, সুরেশের সুন্দর প্রতিভান্বিত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া তাহার উপর তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিল। সুরেশের প্রকৃত অবস্থা তাঁহার অজ্ঞাত থাকিলেও তিনি এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিলেন যে, সুরেশ ইহার পূর্ব্বে আর কখন কলিকাতায় আসে নাই, এবং কলিকাতায় তাহার সুহৃদ বা বন্ধু কেহ নাই। তিনি আরও জানিলেন সুরেশচন্দ্র নিজ অধ্যবসায় দ্বারা নিজের পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই।

ভূপেন্দ্র নাথের বড় ইচ্ছা হইল সুরেশকে কলিকাতায় নিজ বাটীতে রাখিয়া দেন, কিন্তু পাছে ইহাতে ভদ্রসন্তান অপমান বোধ করেন, সেই জন্য প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে না পারিলেও সুরেশের সহিত বন্ধুত্ব স্থায়ী করিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইল। তিনি ট্রেণেতেই সুরেশকে আপনাদের বাটীতে যাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। সুরেশচন্দ্রও এ সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে ট্রেণ হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। ভূপেন্দ্রের নিমিত্ত তাঁহার শকট ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই শকটে উভয়ে ভূপেন্দ্রের বাটীতে পৌছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ সুরেশের ইচ্ছামত তাহার বাসের নিমিত্ত একটী মেস ঠিক করিয়া দিলেন, এবং কয়েক দিন চেষ্টা করিয়া সুরেশচন্দ্র দুই স্থানে 'প্রাইভেট' শিক্ষকের কার্য্যও পাইলেন। ইহাতে সুরেশচন্দ্র পরম সন্তোষলাভ করিয়া জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন এত দিনে বুঝি ভগবান আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দরিদ্র, মর্ম্মাহত, সুরেশ এখন আন্তরিক শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। ধন্য জগদীশ্বর!! এই জন্যই লোকে বলে তুমি অসহায়ের সহায়!

ভূপেন্দ্র নাথ সুরেশচন্দ্রকে অতিশয় প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় জন্মিল। লোকে বলে সমান অবস্থার লোক না হইলে বন্ধুত্ব জন্মে না, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। প্রণয় পাত্রাপাত্র মানে না, হৃদয়ে হৃদয়ে মিল হইলেই ভালবাসা জন্মে। তাহার প্রমাণ ভূপেন্দ্র ও সুরেশ। একজন অতিশয় ধনবানের সন্তান, আর একজন দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে উভয়ের যেরূপ ভালবাসা জন্মিল, যেরূপ প্রগাঢ় প্রণয়ে উভয়ে আবদ্ধ হইলেন, সেরূপ অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

সুরেশ বি, এ, পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন, ভূপেন্দ্র তখন এম, এ, পড়িতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সুরেশচন্দ্র প্রশংসার সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ভূপেন্দ্রনাথও প্রশংসার সহিত

এম, এ, পাশ হইয়াছেন। ছুই বন্ধুতে আবার ল' পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বলা বাহুল্য, সুরেশচন্দ্র অনাবশ্যকবোধে এম, এ, পড়েন নাই। একেবারে ল' পরীক্ষা দিবেন স্থির করিয়াছেন।

(৪)

জ্যৈষ্ঠ মাস। দিবা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। মার্ত্তণ্ডদেব প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রখর কিরণ ছড়াইয়া, যেন ধরিত্রী দেবীকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। কলিকাতা সহরে দিবা যামিনী যে কোলাহল হয়, তাহাও এখন একটু নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে। দৈবাৎ কোন ফেরিওয়ালা "চাই বরফ" "পানি পিনেকা বরফ" বলিয়া হাঁকিয়া যাইতেছে। ক্বচিৎ একখানি শকট গড় গড় শব্দে রাজপথ কাঁপাইয়া আপন গমন-বার্ত্তা জানাইয়া চলিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে ট্রামের "ঘড় ঘড়", "সোঁ সোঁ" শব্দ লোকের কর্ণগোচর হইতেছে। ঠিক এই সময়ে ভূপেন্দ্র নাথ আপন পাঠ গৃহে বসিয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেছিলেন। গ্রীষ্মাতিশয্য হেতু একজন ভৃত্য টানা পাখা টানিতেছিল। কক্ষের প্রায় সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ছিল, পার্শ্বের একটী খড়খড়ির অর্দ্ধাংশ মাত্র খোলা ছিল, কিন্তু তাহার সার্সী বন্ধ, তাহাতে গৃহটী "আধ আলো আধ ছায়া"বৎ হইয়াছিল। ভূপেন্দ্র নাথ একটী সোফায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। এক একবার পুস্তক ত্যাগ করিয়া, অধোবদনে কি চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার তাৎকালিক ভাব দেখিয়া মনে হয় না যে, তিনি পাঠের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। মনে হয়, কোনও গভীর চিন্তায় তাঁহার মন নিবিষ্ট রহিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "দূর হোক ছাই, আর ভাল লাগে না।" এই বলিয়া তিনি হস্তস্থিত পুস্তকখানি সোফার উপর নিক্ষেপ করিয়া গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন বৃদ্ধ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০।৬২ বৎসর হইবে, মস্তকের কেশগুলি শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া তাঁহাকে বেশ বলিষ্ঠ ও সুস্থ বলিয়া অনুমান হয়। চক্ষুদ্বয়ে যেন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ক্রীড়া করিতেছে। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া অপর একখানি চেয়ার দেখাইয়া ভূপেন্দ্রকে কহিলেন, "বোস বাবা।" আগন্তুক ভূপেন্দ্র নাথের পিতা হরিমোহন দত্ত। ইহান পূর্ব্বে কমিসেরিয়েটে কার্য্য করিয়া, প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া এক্ষণে কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

কলিকাতায় বসৎবাটী ব্যতীত আরও ৪।৫ খানি বাড়ী আছে, সেগুলি ভাড়া দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন কাশী এবং এলাহাবাদেও তাঁহার বাড়ী আছে, সেগুলিরও ভাড়া চলিতেছে। এতদ্দ্বারা তাঁহার বিলক্ষণ

দশ টাকা আয় হয়। বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি তিনি নিশ্চেষ্টভাবে কালক্ষেপ না করিয়া নানাবিধ কায়ব্যয় অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাতে অর্থের সমাগম হয়, সর্ব্বদাই তিনি সেই চিন্তায় মগ্ন!

এই সকল ছাড়া তিনি আর একটা নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন,—তাহা বহু অর্থ লইয়া পুত্রদিগের বিবাহ দেওয়া। ষষ্ঠীভাগ্য এবং লক্ষ্মীভাগ্য তাঁহার উভয়ই সমান। মা ষষ্ঠীর কৃপায় তাঁহার ছয়টী পুত্র। কন্যার পিতার নিকট হইতে অধিক ধন পাইবার প্রত্যাশায় তিনি সকল পুত্রকেই উত্তমরূপে শিক্ষিত করিয়াছেন এবং এক এক জনের বিবাহে ৮।১০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ সর্ব্ব কনিষ্ঠ, তাহার বিবাহ হইলেই এই ব্যবসাটি শেষ হয়। এখন তাহারই বিবাহের চেষ্টায় আছেন। কিয়ৎ-ক্ষণ 'এ কথা' 'ও কথা'র পর বলিলেন, "ভূপেন্দ্র তোমাকে একটা কথা বলিব।"

পিতার মুখে এই কথা শুনিয়া আশঙ্কায় ভূপেন্দ্রের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন না জানি আজি পিতা কি কথাই বলিবেন! তিনি জানিতেন কোনও বিশেষ কার্য্য না থাকিলে পিতা তাঁহার পাঠগৃহে আগমন করেন না। তাই তিনি বলিদানের পাঁঠার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে এক বার পিতার মুখাব-লোকন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "আজ্ঞা করুন"।

হরিমোহন বাবু বলিলেন "তোমার সব ভ্রাতার বিবাহ হইয়াছে, তোমার একটা বিবাহ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ আমার মন স্থির হইতেছে না। আমার বয়সও হইয়াছে, কোন দিন আমি মরিয়া যাইব, তোমার বিবাহ না দিয়া আমার মরি-বার ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ তুমি আমাদের কনিষ্ঠ পুত্র, ছোট বৌমাটী আসিয়া ঘর আলো করিয়া বেড়ান, ইহা তোমার গর্ভধারিণীর বড় ইচ্ছা।" এই কথা শুনিয়াই ভূপেন্দ্রনাথ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যে আশঙ্কা করিতে-ছিলেন তাহাই উপস্থিত হইল। তাঁহার হৃৎপিণ্ড কাঁপিতে লাগিল, জিহ্বা ও তালু শুষ্ক হইয়া উঠিল, যেন কি মহা বিপদেই তিনি পড়িয়াছেন! অস্থির ভাবে তিনি সম্মুখের টেবিলের দ্রব্যাদি নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন, এখানের জিনিষটা ওখানে সরাইতে গেলেন, তাহাতে দোয়াতের কালিটা সমস্ত পড়িয়া গিয়া একখানি পাঠ্যপুস্তক নষ্ট হইয়া গেল। দোয়াতটা তুলিয়া রাখিতে গেলেন, কলমটা ভূমিতে পড়িয়া গেল, কলমটা উঠাইতে গিয়া টেবিলের কোণে তাঁহার মস্তকে আঘাত লাগিয়া উহা ফুলিয়া উঠিল। হরিমোহন বাবু পুত্রের এবম্বিধ ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। তিনি আপন মনে পূর্ব্বকথিত বাক্যের সমাপ্তি করিলেন, বলিলেন "তাই আমি স্থির করিয়াছি পরীক্ষাটা শেষ হইলে অগ্রহায়ণ মাসেই তোমার বিবাহ

দিব। হাতিবাগানে বিনোদবিহারী বসুর কন্যার সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। বিনোদ বাবু সৎ জন, বেশ সম্পত্তিপন্ন লোক, তাঁহার ঐ একটী মাত্র কন্যা।

আমি দেখিয়া আসিয়াছি মেয়েটী দেখিতে বেশ। তবে একটু খুঁত আছে, মেয়েটার একটী চক্ষুর সামান্য দোষ আছে। তা' থাক্, তাতে বিশেষ ক্ষতি নাই, অপর চক্ষুটি বেশ ভাল আছে। এ বিবাহে একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, বিনোদ বাবুর ঐ এক মাত্র কন্যা। বিনোদ বাবুর বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু আছে তৎ সমস্তই ভবিষ্যতে ঐ কন্যাই পাইবে। তাই আমি বিবাহের মত করিয়া আসিয়াছি। বিনোদ বাবুদের বনিয়াদী বংশ, তাঁহার অনেক টাকা, বিস্তর বিষয়!! অনেকে ঐ কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এখন ভগবানের ইচ্ছায় শুভ কার্য্যটা শীঘ্র সম্পন্ন হইলে হয়। বিনোদ বাবু লোক বড় অমায়িক, তিনি বলিলেন "আমার যাহা কিছু সম্পত্তি সবই আমার কন্যা ও জামাতার, এর আর দেনা পাওনা কি? তবে এখন একটা চুক্তি করিতে হয় তাই করা, আমি এখন আপনাকে সর্ব্বসমেত পনের হাজার টাকা দিব।"

তিনি বড় ভাল লোক, তাঁহার সহিত আর দর দস্তর করা ভাল দেখায় না, আমি তাঁহার কথাতেই সম্মত হইয়া আসিয়াছি। তোমাকে তিনি বিশেষ রূপে জানেন বলিয়াছেন, আর দেখিতে আসিবেন না, একেবারে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন"। এই বলিয়া হরিমোহন বাবু পুত্রের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ভূপেন্দ্র নাথের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হরি! হরি! তাঁহার দেশহিতৈষিতা, সমাজহিতৈষিতা সকলই কি অতল জলে ডুবিয়া যাইবে? তিনি নিজেই কিনা একটা কানা মেয়ের পিতার কাছে ১৫ হাজার টাকায় বিক্রীত হইতে চলিলেন? ভূপেন্দ্র নাথ ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন, কি করিবেন কি উপায়ে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবেন, কিরূপে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, তাহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। অবশেষে বন্ধুবর্গের নিকট পরামর্শ গ্রহণার্থে গেলেন। কিন্তু বন্ধুগণ তাঁহার মহান্ অন্তরের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাঁহার হৃদয়ের অভূতপূর্ব্ব সদ্বৃত্তি সকলের মর্ম্ম কেহ বুঝিল না। তাঁহার কথা শ্রবণে সকলেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

কেহ বলিল "তোমার পরম সৌভাগ্য যে এমন লোকের জামাই হবে।"

কেহ পরিহাস করিয়া বলিল যে "আমরা যদি এমন শ্বশুর পাই, তাহা হইলে একটা কেন, সাতটা কাণা মেয়ে বিবাহ করিতে পারি।"

কেহ বা বঙ্কিম বাবুর রজনীর দৃষ্টান্ত

দিয়া কহিল—"এখন 'কাণা' বলিতেছ, একদিন ঐ কাণার কাছে কেনা হইয়া থাকিবে।"

কেহ বা পরামর্শ দিলেন—"এখন ঐ কাণাকে বিবাহ করিয়া বিষয়টা হস্তগত কর, পরে যদি স্ত্রী মনোমত না হয়, তবে আর একটী মনোমত পাত্রী বাছিয়া লইয়া আবার বিবাহ করিও।"

এ সকল বন্ধুবর্গের কথা ভূপেন্দ্র নাথের আদৌ ভাল লাগিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"হায়! সমাজের যদি এমনি অধঃপতন না হইবে, তবে মানুষের এত দুর্দ্দশা হইবে কেন? ইহারা বলে কি? একি ভয়ঙ্কর কথা? অর্থলোভে বিবাহ করিয়া শেষে সেই নিরপরাধা বালিকাকে ইহারা পরিত্যাগ করিতে কহে! ধিক্! ইহারা কি মানুষ? না ইহারা পিশাচ? হা ভগবন্! কতদিনে আবার এদেশে ধর্ম্মজ্ঞান ফিরিয়া আসিবে? এখন ইহাদের নিকট অর্থই একমাত্র ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সব। অর্থই কেবল ইহাদের মূল মন্ত্র!"

হায়! এখন তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ সুরেশ চন্দ্র কোথায়? সুরেশ ভিন্ন এ বিপদোদ্ধারের পরামর্শ দিবার আর কেহই নাই। সুরেশচন্দ্র গ্রীষ্মাবকাশে বর্দ্ধমানে পিতামাতার নিকট গিয়াছেন। এক মাসের মধ্যে তাঁহার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি নিকটে থাকিলে হয় ত উভয়ে মিলিয়া কোন না কোন সদ্যুক্তি স্থির করিতে পারিতেন।

ভূপেন্দ্রনাথ নিরাশচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি কল্পনায় কত সুখের চিন্তা করিতেছিলেন, সমাজের দুর্নীতিসংস্কার করিবেন বলিয়া কত আশা করিতেছিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার চিত্তের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি এখন একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। নিজ বাসগৃহ কারাগৃহের ন্যায় তাঁহার মনে হইতে লাগিল। এখনও বিবাহের বিলম্ব আছে, তথাপি তিনি এমনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, যেন অদ্যই তাঁহার বিবাহ! ভূপেন্দ্রনাথ জানিতেন, তাঁহার পিতার যে কথা, সেই কাজ, ইহার আর অন্যথা হইবে না। তাই তিনি চতুর্দ্দিকে বিবাহের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া অনন্যোপায় হইয়া সকল ঘটনা সবিস্তারে লিখিয়া সুরেশকে একখানি পত্র পাঠাইলেন। যথাসময়ে পত্র সুরেশের হস্তগত হইল। পত্র পাঠ করিয়া সুরেশ সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। তিনি পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন বটে, কিন্তু কি এক গভীর চিন্তার রেখা তাঁহার বদনমণ্ডলে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

ভৈরবী।

(৩)

ভৈরবী বলিতে লাগিলেন "আমার বয়স যখন দশ এগারো বৎসর হইল, তখন হইতেই আমার বিবাহের সম্বন্ধ আরম্ভ হইল। বাবার যশঃ, ধন ও মান যথেষ্ট ছিল। আমাকে লোকে 'পরমা সুন্দরী' মনে করিত। সুতরাং অনেক 'সুপাত্রের' তালিকা লইয়া ঘটক ঘটকী হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল।

এইখানে আমার বাবার প্রকৃতির একটু পরিচয় দিতে হইতেছে। বাবার অনেক গুণ ছিল, তিনি বিদ্বান্, চরিত্রবান, ভগবদ্ভক্ত, এবং সদাশয় লোক ছিলেন। কিন্তু দোষের মধ্যে তিনি বড় একগুঁয়ে ছিলেন, যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা না করিয়াই ছাড়িতেন না। কাহারও উপরোধ, অনুরোধ অথবা উপদেশ মানিতেন না। এই জন্যই আমি বয়ঃপ্রাপ্তা না হইলে তিনি আমার বিবাহ দিবেন না, স্থির করিলেন। ঘটক ঘটকীদিগের মধুর বাক্য, প্রলোভন, এবং নানা প্রকার তোষামোদ, সকলই ব্যর্থ হইল।

আমি যখন পনর বৎসরের হইলাম, তখন বাবা একটী মনোমত পাত্র পাইলেন। পাত্রটি দেখিতে অতি সুন্দর, বি, এ, পাশ; সচ্চরিত্র, নাম সুললিত রায়।"

আমি দেখিলাম এই নামটী বলিবার সময়ে ভৈরবীর কথা জড়াইয়া, এবং গলা ধরিয়া গেল। আমি কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া ভৈরবী বলিতে লাগিলেন "তিনি খুব বড় লোকের ছেলে। প্রায় শতাধিক পাত্রের মধ্য হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়া, বাবা আমার ভাবী শ্বশুরকে বলিলেন 'যতদিন আমার কন্যার দুইটী সন্তান না হইবে, ততদিন সে আপনার গৃহে বাস করিতে পারিবে না। যখন তাহার দুইটী সন্তান হইবে, তখন সে দ্বিতীয় সন্তানটী লইয়া আপনার গৃহে যাইবে, আর প্রথমটী আমার কাছে থাকিবে। কেননা এই কন্যাটী ব্যতীত আমার আর সন্তান নাই। এই বিষয়ে আপনার সম্মতি পাইলে আমি আপনার পুত্রকে কন্যাদান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।'

ভাবী শ্বশুরমহাশয় আমার পিতৃদেবের সন্তানবৎসলতা দেখিয়া আনন্দে তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন।

মহাসমারোহে সেই পাত্রের সহিত আমার শুভ বিবাহ হইল। বিমাতা বলিলেন 'জ্যোৎস্না! আজি যেন চাঁদের পাশে রোহিণী ফুটিয়াছে।'

আনন্দে ও লজ্জায় আমার মুখ লাল হইয়া উঠিল। হায়, তখন ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহার কিছুই জানিতাম না!"

(৬)

ভৈরবী আবার বলিতে লাগিলেন "বিবাহের পরে আটমাস তাঁহার সহিত আমি জীবনের সকল সুখ, সকল আনন্দ ভোগ করিয়াছিলাম। দুই তিন দিন অন্তর বাবা তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিতেন। তিনি পাঁচ সাত দিন থাকিতেন। তিনি যখন আসিতেন, তখন আমি স্বহস্তে সুন্দর করিয়া শয্যা রচনা করিতাম, ফুলের তোড়া গাঁথিয়া টেবিলের উপরে রাখিতাম, বঙ্কিমবাবুর দেবীচৌধুরাণী, রবিবাবুর গল্প, মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য, কুমারসম্ভব, উত্তরচরিত, শেলী, টেনিসন, প্রভৃতি পুস্তক সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিতাম, নিজে নিজে ইচ্ছানুরূপ চুল বাঁধিতাম, ফিরোজা বা গোলাপী রঙের সিল্কের শাড়ী পরিতাম, বেল ফুলের গ'ড়ে গলায় দিতাম। তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য নহে, তিনি প্রীত হইবেন বলিয়া। তাঁহাকে আনন্দিত করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম।

তিনি কি করিতেন শুনিবে? তিনি সেই বালিকা বয়সেও আমাকে কেবল আমোদ প্রমোদের সহভাগিনী বা শয্যা-সঙ্গিনী মনে করিতেন না। আমি যাহাতে প্রকৃতরূপে তাঁহার সহযোগিনী সহধর্ম্মিণী হইতে পারি, আমাকে সেইরূপ শিক্ষা দিতেন। তাঁহাকে আমি কখনও জ্ঞানদাতা গুরু, কখনও সমবয়স্ক বন্ধুরূপে দেখিতাম। তাঁহার রূপগুণ এবং সহৃদয়তায় আমি তাঁহার জন্য পাগল হইয়াছিলাম। আর অধিক কি বলিব!

একদিন পূর্ণিমার রাত্রি। চাঁদের আলোকে চারি দিক উজ্জ্বল হইয়াছিল। সেই সঙ্গে মধুর বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল। চীনা মাটির টবে গোলাপ, বেল ফুটিয়া সৌরভ, শোভা ঢালিতেছিল। আমি বারাণ্ডায় শুইয়াছিলাম। স্বামী আমার শিয়রে বসিয়া রবিবাবুর 'চিত্রাঙ্গদা' পড়িতেছিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিলাম। সহসা আঁধার দেখিয়া দুজনেই আকাশের দিকে চাহিলাম, দেখি একখানা কালো মেঘে সে চাঁদ, সে আলো, সবই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আমার মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল। কাতরস্বরে বলিলাম, 'আহা! এমন চাঁদ এমন আলো সবই নিভিয়া গেল!'

তিনি সকরুণ হাসি হাসিয়া, আমার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া বলিলেন, 'জ্যোৎস্না! মানুষের ভাগ্যও এই রকম। এই দেখ সুখের জ্যোৎস্না, এই আবার মেঘের আঁধার। আমাদের অদৃষ্টে কি আছে, তাহাইবা কে জানে?'

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কি অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তখন উঠিয়া বসিয়া তাঁহার সেই বিশ্বস্ত, অভয়প্রদ, সৌম্য মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে সব ভয় ভাবনা ঘুচিয়া গেল। হায়! কপালে যে

সুখের রেখা ছিল, তাহা ঐ কয়টী দিনেই মুছিয়া গেল।'

খুব জোরে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভৈরবী খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

আমার মনটা বড়ই ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। আমি পুরুষ হইয়ে লোকে নিশ্চয়ই আমাকে 'কাপুরুষ' বলিত।

(৫)

ভৈরবী পরে বলিতে লাগিলেন "একদিন আমার শ্বশুর আমার বাবাকে বলিয়া পাঠাইলেন 'আমার ছেলেকে ডাক্তারি পড়াইতে বিলাতে পাঠাইব, বেহাই মহাশয়কে কিছু সাহায্য করিতে হইবে।'

বাবা সহসা ক্রোধে অধীর হইলেন। বলিলেন 'সুললিত বি, এল, দিয়া দেশে থাকিয়া হাইকোর্টে ওকালতী করুক, ভাল উকিল হইলে কালে জজ হইতে পারিবে। বিলাতে যাইবার আবশ্যক নাই—সাহেবি ফ্যাসন শিখিয়া, চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।'

শ্বশুর জেদ করিলেন 'ছেলে যাহা হয় হউক, আমি যদি সদ্বংশে জন্মিয়া থাকি, তবে আমার ছেলেকে নিশ্চয়ই বিলাতে পাঠাইব। কাহারও কাছে কোন সাহায্য চাহি না।'

বাবা বলিলেন 'যদি আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া সুললিত বিলাতে যায়, তবে আমার সহিত তাহার আর সম্বন্ধ থাকিবে না। আমার মেয়েকে তাহার বাড়ীতে এ জন্মে পাঠাইব না, জামাতার মুখও দেখিব না।'

শ্বশুর বলিলেন 'তাহাই হউক। কিন্তু শেষে আমার পায়ে ধরিয়া যেন না কাঁদেন।'

এই দুই ভয়ানক সংঘর্ষণের ফলে আমার জীবন পিষিয়া গেল। আমি বিমাতার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

বিমাতা বলিলেন 'আমি কি বলিব জ্যোৎস্না। উনি তো কারো কথা শুনেন না, তুমি মা, জামাইকে একখানা পত্র লেখ।'

মা'র কথা শুনিয়া আমি যেন অকূল-সমুদ্রে পড়িয়া কূল দেখিলাম। খুব মিনতি করিয়া বিলাত যাইতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে গোপনে এক পত্র লিখিলাম।

প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিলেন 'জ্যোৎস্না! বাবার কথা এ জীবনে লঙ্ঘন করি নাই, আজি করিলাম। তোমাকে পত্র লিখিতে বাবার নিষেধ, তাহা শুনিতে পারিলাম না। বাবার আদেশে বিলাতে আমাকে যাইতেই হইবে—অদৃষ্টে কি আছে, জানি না।'

পত্র পড়িয়া আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। পেট বেদনা করিতেছে বলিয়া শুইয়া পড়িলাম।

বাবা একজন ডাক্তার ও একজন কবিরাজ দিয়া আমার চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

Jomp 3906 21-27/8/07

কয়েক দিনের পরে তাঁহার ইয়োরোপ যাত্রার সংবাদ পাইলাম। আমি মনঃকষ্টে লেপ মুড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বাবা যাহাই করুন, আর শ্বশুর যাহাই বলুন, উনি সত্য সত্যই আমাকে না বলিয়া বিলাতে গেলেন, আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল।

স্বামী বিলাতে গিয়া আমাকে একখানিও পত্র লিখিলেন না। আমার বুকে আগুন জ্বলিতে লাগিল।

আমি আর চুল বাঁধিলাম না, ভাল কাপড় পরিলাম না, হাতে দুইগাছি শাঁখা রাখিয়া সব গহনা খুলিয়া ফেলিলাম। বাড়ীর কেহ কিছুই বলিলেন না।

বাবা আমাকে ভগবদ্গীতা পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন।”

(৬)

ভৈরবী বলিতে লাগিলেন, “পাঁচ বৎসর পরে তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন। শুনিয়া আমার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা চলিয়া গেল। ইচ্ছা হইল বাবার পায়ে ধরিয়া বলি, আমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিন।

তাহা পারিলাম না।

এদিকে আমার অজ্ঞাতে আমার সর্ব্বনাশের আয়োজন হইল। আমার শ্বশুর বাবাকে বলিয়া পাঠাইলেন ‘আমার ছেলে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আপনি তাহার নিকটে মেয়েকে পাঠাইবেন কিনা? এই আমার শেষ কথা।’

বাবার কি দুর্ব্বুদ্ধি হইল, তাহা বলিতে পারি না। এ সংসারে মেয়ের বাপ হইলে ‘চোর’ হইয়া থাকিতে হয়, বাবার মত তেজস্বী ব্যক্তি তাহা মনে রাখিতে পারেন নাই।

সুতরাং ক্রোধে স্ফুরিতাধর হইয়া বাবা বলিলেন ‘আমার কন্যাকে কখনও পাঠাইব না; আমার ঘরে তাঁহার অন্ন আছে।’

তদধিক ক্রুদ্ধ হইয়া আমার শ্বশুর পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। আমার স্বামী প্রথমে তাহাতে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা, নিজের অপমানের কথা বলিয়া, পুত্রকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ও পরিবার হইতে পরিহার করিবার ভয় দেখাইয়া এবং সর্ব্বশেষে নিজে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়া, তাঁহাকে সম্মত হইতে বাধ্য করিলেন।

আমি বাঙ্গালির মেয়ে, সমাজেও নগণ্য, পরিবারমধ্যেও নগণ্য, তাই কেহ আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিল না—স্বামীর পুনরায় বিবাহ হইল।”

শেষোক্ত কথাটী বলিবার পরেই ভৈরবী যেন অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার গায় যেন গরম জলের ছিটা লাগিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন।—

“বাবার আর সন্তান হইল না বলিয়া তিনি এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। তারপরে আমি একবার বাবার অনুমতি লইয়া আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত শ্রীক্ষেত্রে যাই, কিন্তু আর দেশে ফিরি নাই।”

আমি বলিলাম "আপনার পিতা কি আপনার অনুসন্ধান করেন নাই?"

ভৈ। তিনি জীবিত নহেন। আমার তীর্থযাত্রার সময়েই তাঁহার পরলোক-গমনের সংবাদ পাই।

আমি। আপনর শ্বশুর কি জীবিত আছেন?

ভৈ। না স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের কিছুদিন পরেই তিনি পর-লোকে গমন করিয়াছেন।

আমি। আপনার স্বামী কি আপনার খোঁজ খবর লইয়াছিলেন?

ভৈরবীর সেই রক্তকমলতুল্য রাঙা মুখ আরও রাঙা হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "পিতৃবিয়োগের পরে তিনি আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়া-ছিলেন, কিন্তু যখন শুনিলাম, তাঁহার দ্বিতীয়া ভার্য্যা সরলাবালার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় তাঁহার অঙ্গুলিতে আছে, আমি আর তাঁহার সহিত দেখা করিলাম না।"

এই কথা বলিতে বলিতে সেই জ্ঞান-বতী, পরিব্রাজিকা দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলাম।

ক্ষণকাল পরে তাঁহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিলাম "ভগিনি! কেন দেখা করিলেন না? আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শিনী, আপনাকে আমি আর কি বলিব? দেখুন! হিন্দুরমণীর স্বামী সকল অবস্থাতেই অপরিত্যাজ্য।"

আমার আর বলা হইল না। দেখি ভৈরবীর সে রোরুদ্যমানা মূর্ত্তি আর নাই। তিনি ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত উন্নত-শীর্ষে, ত্রিশূলহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আরক্তমুখে, আরক্তনেত্রে বলিতে লাগি-লেন "তুমি কি বলিলে?—আমি আমার জীবন থাকিতে তাহা কখনই পারিব না। একদিন আমি যাঁহার হৃদয়ের রাজ-রাজেশ্বরী ছিলাম, আজি যে তাঁহার হৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনীমাত্র হইয়া রহিব, এ জীবনে তাহা কখনই পারিব না! আমার স্বামীকে আর একজন 'আমার স্বামী' বলিয়া ভালবাসিতেছে, আদর করিতেছে, যত্ন করিতেছে, তাঁহার হৃদয়-খানি নিজের আয়ত্ত করিবার জন্য কত তপস্যা করিতেছে, আমি সেই দৃশ্য দেখিব? তা আমি পারিব না। তাঁহার হাতে অন্যের নামাঙ্কিত আংটী দেখিয়া তাঁহাকে আমার বলিয়া মনে করিব, তা আমি পারিব না। হায়! আমি আপন ধনে আপনি চোর হইয়া রহিব?—না না, তা' আমি কখনই পারিব না। স্বামীকে ভাগ করিয়া অন্যের হস্তে দিতে পারিব না বলিয়াই আমার স্বামীকে—যিনি আমার জগতের বন্ধন, ইহকালের আনন্দ, পরকালের পুণ্য,—সেই পতিদেবতাকে এ জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি! জন্মান্তরে তাঁহাকে পাইব, এই কামনায় তীর্থে তীর্থে বেড়াইতেছি, সন্ন্যাসধর্ম্ম সাধন করিতেছি, এ জীবনে তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ ভিন্ন তাঁহার সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ নাই।

আমি মনে মনে তাঁহার চরণ পূজা করিয়া দিন কাটাইতেছি, এবং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিও এইরূপে কাটাইব! তুমি রমণী হইয়া রমণীহৃদয়তত্ত্ব বুঝিলে না?"

আমাকে ধিক্কার দিয়া নিমেষমধ্যে ভৈরবী চলিয়া গেলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া এত অন্যমনা হইয়াছিলাম যে, তাঁহার চলিয়া যাওয়া বুঝিতে পারিলাম না। সেই হইতে আর কোথাও তাঁহাকে দেখিলাম না, কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান পাইলাম না। সুতরাং কয়দিন পরে ক্ষুণ্ণমনে দেশে ফিরিয়া আসিলাম।

সে তো অনেক দিনের কথা, কিন্তু এখনও যেন তাহা মানসচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। সেই অভিমানিনী পতিপ্রাণার আকুলতামাখা নীরব হাহাকার, উদ্‌ভ্রান্ত সমীরণের মত শূন্য হইতে মহাশূন্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যেন দেখিতে পাই, সেই অতৃপ্তাকাঙ্ক্ষ-পরিপূর্ণ হৃদয়খানি বর্ষার প্রবল স্রোতে ভাসমান, তরঙ্গ-তাড়িত ফুলের মত অকূল মহাসমুদ্রের পানে ভাসিয়া চলিতেছে। তাহা এ জগতে কোথাও বিরাম লাভ করিতে পারিবে কি না, জানি না।

লেখিকা

শ্রীম—

প্রার্থনা।

কি মধুর সুরে গান ওই পাখী গায়,
ও কি পিতা ডাকিতেছে কেবলি তোমায়?
ক্ষুদ্র কণ্ঠে এত সুধা লভিল কি করে,
কে দিয়েছে মধুর সুরে ঐ কণ্ঠ ভরে।
দাও দেব মোরে শক্তি অমনি মধুর,
তোমারে ডাকিতে আমি পাই যেন সুর।
প্রভাত গগন সম প্রশান্ত বিমল
হউক মোর ক্ষুদ্র হৃদি, শান্ত, সরল।
পাই যদি নব শক্তি, সুমধুর স্বরে
গাহিব বন্দনা গান আনন্দ অন্তরে।
দিবানিশি সে অন্তরে পাতিয়া আসন,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি তুমি করিবে গ্রহণ।
ওহে দেব রাজরাজ অনন্ত মহান্
তোমাতেই মগ্ন হয়ে থাকে যেন প্রাণ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

আন্তরিক পবিত্রতা।

অসার উপদেশে অপর ব্যক্তিকে দুঃখ দান করা কিম্বা আপনাকে উহাতে লিপ্ত করা কেবল অস্থিরতার লক্ষণ। শরীরের তপস্যা পবিত্রতা, চিত্তের তপস্যা আপনাকে বশ করা, আত্মাকে পবিত্র করা ও পরোপকার করিবার ইচ্ছা পোষণ করা। শব্দের তপস্যা সত্য ও নম্রতাপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করা।

মনের পবিত্রতা ভিন্ন ঈশ্বরের পূজানুষ্ঠান ও বৈরাগ্যে কি উপকার? "আমি কাশী যাইব" এ কথা কেন বল? পবিত্র তীর্থে যাইবার নিমিত্ত কেন লালায়িত হও? প্রকৃত কাশীধাম দুষ্কর্মীরা কেন পাইবে?

যদিও আমি বহু অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াই, তথাপি সেখানে পবিত্রতা পাইব না; কি আকাশে কি জলে, কি স্থলে কোথাও পবিত্রতা নাই। প্রথমে তুমি দেহকে পবিত্র কর, তখন সম্রাটকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পাইবে।

ভক্ত আপনার আত্মার ক্রমোন্নতিতে তাঁহার ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারে। যে নিজ হৃদয়কে পবিত্র করিয়াছে, সেই সার তত্ত্ব জানিয়াছে।

তোমার শরীরকে একটি দেবালয়রূপে প্রস্তুত কর এবং নিজে সংযমী হও, কুচিন্তা ত্যাগ কর এবং অন্তশ্চক্ষু দ্বারা ঈশ্বরকে দর্শন কর। যখন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব, তখন আপনাকেও চিনিব।

পবিত্র তীর্থ কাশীধামে গমন করিলেই শূকর হস্তী হইবে না, কুকুর সিংহ হইবে না। সেইরূপ মানবও তীর্থে পদার্পণ করিলেই পুণ্যাত্মা হইবে না।

তোমার কার্য্য ও প্রার্থনা যেরূপ হউক না কেন, তুমি সত্যের আশ্রয় না লইলে কখনও সুখী হইবে না। যে সত্যধর্ম্ম পালন করে, সেই দ্বিজ। আমাদের চরম সুখের আকর হৃদয়। সে ব্যক্তি মূর্খ, যে ইহাকে অন্যত্র লাভ করিতে চায়। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।

কেন তুমি পর্ব্বত হইতে প্রস্তর কুড়াইয়া আনিয়া সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছ? নিজের গৃহের বা অপরের জড় গৃহদেবতা অপেক্ষা, এবং সমুদয় উপদেবতা অপেক্ষা আত্মস্থ বিশ্বদেবতা শ্রেষ্ঠ।

কুমারী সুনীতি ভাদুড়ী,
ভেলুপুরা, বেনারস সিটি।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

ইংরাজী ১৮৪০, বঙ্গাব্দ ১২৪৭ সালের ৩রা পৌষ, কৃষ্ণপক্ষ, নবমী তিথিতে আমি জন্মগ্রহণ করি। জন্মস্থান মজিলপুরের বাটী।

বাল্যকালের কথা যতদূর স্মরণ হয়, কিনি ঝি আমাকে বড় আদর করিত। প্রতিবাসী পুরোহিতদিগের বাটীর পিসি ঠাকরুণ ও ঠাকুর দাস মামাও আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। বাল্যকালে আমার বাহ্যাড়ম্বরে বিতৃষ্ণা ছিল। আমি কখন নূপুর পায়ে দিতাম না। আমার বড় রোক ছিল, যাহা ধরিতাম তাহা না হইলে ছাড়িতাম না। হারার মা আসিয়া আমাকে মিষ্ট কথা বলিয়া ভুলাইত।

বাল্যসঙ্গিনী ব্রহ্মময়ীর সহিত সামুকের ঘুটী ও কাঁটালপাতার তাস করিয়া খেলাইতাম। অল্প বয়সে আমার রক্ত আমাশয় হয়, তাহাতে জীবনসংশয় হইয়াছিল। রাঙা কৌটার চিনি খড়িকায় করিয়া খাইতাম। পিতা প্রতিদিন মিঠাই কিনিয়া দিতেন।

বিদ্যারম্ভ—জগু গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় এবং নূতন স্থাপিত বাঙ্গালা স্কুলে দাদার সহিত যাইতাম। হাতে খড়ি হইবার পূর্ব্বেই লেখা আরম্ভ হয়। মামা আমার জন্য নূতন তালপাতা পাঠাইয়া দিতেন। কখন কখন আমার লেখা পাইত (লেখার ইচ্ছা হইত) এবং কখন কখন পাইত না। আমি প্রতিদিন একটি নূতন লেখা শিখিতাম। ৬।৭ বৎসরের সময় আমি চন্দ্রগুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি হই।

১৮৫০ সালে দশ বৎসরের সময় পিতৃ-বিয়োগ হইলে লেখা পড়া একরূপ বন্ধ হয়। পরে এ পাঠশাল সে পাঠশাল করিয়া স্কুলবাড়ীতে মুক্তারামের পাঠশালায় যাওয়া হয়। সেখানে ব্রজনাথ বাবু পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দেন। পরে তিনি তাঁহার বাটীতে লিখিতে নিযুক্ত করেন।

তাহার পরে বাঙ্গালা স্কুলে বর্ণমালার ক্লাশে ভর্ত্তি হই। অল্প দিন পরে শ্যামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় একেবারে ৩।৪ ক্লাশ উপরে নীতিকথার ক্লাশে আমাকে তুলিয়া দেন। যে শ্রেণীতে যখন পড়িতাম প্রায়ই আমি সর্ব্বপ্রথম থাকিতাম। অল্প কালের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম।

ব্রজনাথ বাবুর সহিত মিলনে তাঁহার অভিধান লেখায় অনেক প্রকার জ্ঞান বাড়িতে লাগিল। এখানে তাঁহার পুত্র শিবকৃষ্ণ বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে আমার ধর্ম্মোন্নতির বিশেষ সুবিধা হইল। এই সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী নামে একটী সভা করা যায়। গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী তাহাতে সভাপতিত্ব করেন।

ইহাতে রচনা লেখা ও ভাল পুস্তক পড়া হইত। শিবকৃষ্ণ বাবু উৎসাহ দিয়া রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা পাঠের সুবিধা করিলেন। প্রতি সপ্তাহে ছাত্রগণ ও অপরাপর লোক একত্র হওয়ায় বিশেষ উপকার হইত।

বাল্যকালে পুস্তকপাঠে আমার বড় অনুরাগ ছিল। বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কালীবিলাস পুস্তক পড়িতে শিখি। পরে নিজের আমোদের জন্য এবং পাড়ার মেয়েদিগকে শুনাইবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও চণ্ডী প্রভৃতি পুথী পড়িতাম। দোল খরচের পয়সা প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল বই কিনিতাম। সকল পুস্তক কিনিবার সঙ্গতি না থাকাতে মধ্যে মধ্যে পুস্তক হস্তে লিখিয়া লইতাম। মামা এ বিষয়ে সহায়তা করিতেন। একখানি পুস্তক সঙ্গে না লইয়া কোথাও যাইতাম না। সভার সঙ্গে একটী লাইব্রেরী ছিল, তাহাতে পুস্তকপাঠের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

পুস্তক লেখা—বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় আমার একজন বাল্যসখা ছিলেন। তাঁহার বাটীতে গিয়া নানাবিধ পদ্য লিখিতাম। সেইগুলি পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৫৯ সালে রোম রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ছাপা হয়। অনেকগুলি সঙ্গীত সঙ্গীতরত্নাবলী নামক পুস্তকে মুদ্রিত হয়। এই সময়ে "বঙ্গ হিতার্থিনীর" সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করা যায়।

ইংরাজী শিক্ষা—ইহার পর ইংরাজী শিক্ষার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, কিন্তু অবস্থা গতিকে শীঘ্র হইয়া উঠে নাই। মজিলপুরে জনৈক সাহেব মাষ্টার স্কুল করিলে ইংরাজী পড়িবার জন্য মাতার নিকট কাঁদিতে লাগিলাম। মা কষ্ট করিয়া ৷৷০ আট আনা মাহিনা দিয়া ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এইরূপে কষ্টে ও ঈশ্বরকৃপায় স্বাবলম্বনে আমার ইংরাজী শিক্ষা হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পদিনে সাহেব মাষ্টার চলিয়া গেলে উহা বন্ধ হইল। পরে যাদব মাষ্টার আমাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহার পরে চন্দ্র মাষ্টার মহাশয়ের কাছে রীতিমত শিক্ষা হয়। তৎপরে মজিলপুরের ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয় ও নব মাষ্টার তাহার শিক্ষক হন। শিবকৃষ্ণ বাবু আমাকে ঘরে Lennie's Grammar ও Reader No. IV পড়াইয়া আমাকে সেই স্কুলের প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত করিয়া দেন। পুস্তকাদির সহায়তা দ্বারাই ইহা হয়। পরে ইহাদিগের সাহায্যে ভবানীপুরে আসিয়া মিসনরী স্কুলে পড়িয়া এণ্ট্রান্স পাস হইলাম। গৌর বাবুরা কত ভদ্রতা সহকারে আমাকে বাটীতে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, উমেশ খৃষ্টান বটে, কিন্তু পাঠে বড় অনুরাগী। ১৮৫৯ সালে ভবানীপুরে আসাতে ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমার যোগ হইল। তথায় বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। ইহার তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সত্য-ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহার পর মজিলপুরেও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে আমার ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা হয়। হরিদাস বাবু ও হেম বাবু উৎসাহদাতা ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত খাদ্যদ্রব্য।

আরবদেশে অশ্ব একটী উপাদেয় খাদ্য। মিসরদেশে উষ্ট্রের শরীরের অধিকাংশ মাংস সুস্বাদু খাদ্যবলিয়া খাওয়া হয়।

প্রাচীন চীনবাসিগণ টাট্‌কা ডিমের চেয়ে পচা ডিম ভালবাসে।

ভারতবর্ষে হাতীর মাংস অত্যন্ত সুখাদ্য বলিয়া বিবেচিত।

দক্ষিণ আমেরিকাবাসিগণ সাপ, গিরগিটী, বিছা প্রভৃতি খায়।

হিন্দুস্থানের ইতর লোকেরা পচা মাংসের জন্য কুকুর, শকুনী এবং চিল পাইলেই সন্তুষ্ট হয়।

চীনবাসীরা কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর এবং সাপ খাইতে ভালবাসে; ভল্লুকের থাবা ও পাখীর বাসা অত্যন্ত সুস্বাদু।

আমেরিকায়বড় বড় শুঁয়োপোকা ভাল খাদ্য।

জাভাদেশীয় সোয়ালো পাখীর আহারোপযুক্ত বাসা সকল এরূপ বহুমূল্য যে এক ডিসের উপযুক্ত বাসার দাম ১৫ পাউণ্ড।

ম্যাগডেলেনা নদীর তীরবর্ত্তী স্ত্রীলোকেরা কুমরের চাকে ভাণ্ড গড়িতে গড়িতে বড় বড় কাদার ডেলা সকল খাইয়া থাকে। আর বৃষ্টির পরেই ছেলেরা যাহাতে মাটী খাইতে না যাইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের ছেলেরা সচরাচর মাটী খাইতে ভাল বাসে।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। আমাশয় রোগের ঔষধ—জীরে চূর্ণ ও শ্বেত ধুনার চূর্ণ তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া উহার /০ আনা পরিমাণ চূর্ণ বেল পাতার রস কিম্বা ঘোলসহ দিনে ২।৩ বার সেবন করিলে সাদা ও রক্তামাশয় আরোগ্য হয়।

২। অর্শ রোগের ঔষধ—কৃষ্ণ তিল (খোসা ছাড়ান), রক্ত চন্দনচূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষুর গুড় সমস্ত তুল্য পরিমাণে এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় /০ এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

৩। হাঁপানি রোগের ঔষধ—আপাঙের মূল ৴০ আনা, শ্বেত চন্দন ঘসা ।০ চারি আনা, গোলমরীচ ৭ গণ্ডা জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া প্রাতে ১ বার জলসহ সেবন করিলে শ্বাস (হাঁপানী কাসী) আরোগ্য হয়।

৪। বমি রোগের ঔষধ—ছর্দ্দি অর্থাৎ বমি রোগে শসার বীচি চূর্ণ ৵০ আনা ও কুলের আঁঠির শাস চূর্ণ ৵০ আনা, দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৫। মূত্ররোগের ঔষধ—মাদার ফলের (ডহয়ার) বীচি চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা ও চিনী ॥০ তোলা /০ এক ছটাক জলসহ সেবন করিলে মূত্ররোগ নিবারিত হয়।

৬। মূত্রকৃচ্ছ্রে তেলা কুচার মূল

বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

৭। সমস্ত মেহ রোগে কাঁচা হলুদের রস ও আমলকী চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৮। স্বপ্নচ্যুতিতে অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় শুক্রপাত রোগে রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় কাবাব চিনীর চূর্ণ ৵৹ আনা ও কাশীর চিনী ৵৹ আনা এক সঙ্গে সেবন করিলে স্বপ্নচ্যুতি নিবারিত হয়।

৯। শুক্রমেহে এবং শুক্রক্ষয় জন্য দৌর্ব্বল্যে শিমুলমূলের রস ১ তোলা মধু সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

নূতন সংবাদ।

১। কালিফোর্নিয়ার "লিক অবজারভেটারি"র শ্রীযুক্ত জিকসাহেব ৭ই জুলাই তারিখে একটী নূতন ধূমকেতুর আবিষ্কার করিয়াছেন।

২। লণ্ডনের "ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিক" হইতে ডোরা মাইকদ ও হোপ বসু নাম্নী দুইজন ভারতবর্ষীয়া রমণী সম্মানের সহিত সঙ্গীতবিদ্যায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

৩। ব্রহ্মদেশ হইতে এডওয়ার্ড স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে এক লক্ষ আট হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

৪। ব্রিটিস সাম্রাজ্যের নানা স্থানে তারের সংবাদ পাঠাইতে যে মাসুল লাগে, তাহা কমাইবার চেষ্টা হইতেছে এবং বিনা তারে সংবাদ প্রেরণেরও ব্যবস্থা করা হইবে এইরূপ শুনা যাইতেছে।

৫। এ বৎসর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার পরীক্ষায় ২৪ জন প্রথম, ৪৩ জন দ্বিতীয় এবং ২৮ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

৬। চীনদেশীয় কতকগুলি লোক জঙ্গল কাটিতে কাটিতে কম্‌ট্রাম্ বাগেল-কাম নামক এক লতার আবিষ্কার করিয়াছে। এই লতার রস সেবন করিলে আফিম সেবনের অভ্যাস দূর হয়। ঐ পত্রের রসের গুণ পরীক্ষিত হইতেছে।

৭। আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৯ই জুলাই বঙ্গদেশের আর একজন কৃতী পুরুষ রায় বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ৭২ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনের প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

৮। শুনা যাইতেছে, অষ্টম গুর্খা পল্টনের প্রথম সৈন্য দলের অধ্যক্ষের পত্নী শ্রীমতী উইলসন স্বামীর জীবনরক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে দুইটী সুশিক্ষিত কুকুর আনাইতে-

ছেন। ঐ কুকুর শত্রুর আগমন অবগত হইয়া তাঁহার স্বামীকে সময়ে সংবাদ প্রদান করিবে। ফরাসী ও জর্ম্মাণ সৈন্যগণ এইরূপ কুকুর প্রায়ই ব্যবহার করে।

৯। গত ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত মহিলাদ্বয় বৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

নিলহেলমিনা নাথানিয়েল—ডায়োসেসন কলেজ ২৫৲

আইরিন মিত্র—ডায়োসেসন কলেজ ২০৲

১০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বাবু ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক নিম্নলিখিত মহিলাদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৯০৮—৯।

শ্রীমতী লীলাবতী দাস—বিষয়—গার্হস্থ্য পাকপ্রণালী ৪৫৲

১৯০৯—১০।

শ্রীমতী চারুমতি দেবী—বিষয়—শিশুমৃত্যু ও মাতাদিগের কর্ত্তব্য। ৪৫৲

বামারচনা।

স্তোত্র।

দয়াময় তুমি নাথ জীবের জীবন।
তুমি বিশ্বরূপ দেব জগতকারণ।
তুমি বিশ্বপতি, তুমি বিশ্বের আধার।
তোমার মহিমা দেব অনন্ত, অপার ॥১॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ।
তুমি জল, তুমি স্থল, তুমি হুতাশন।
তুমি ব্যোম, তুমি সূর্য্য, তুমি সুধাকর।
অনন্ত মহিমা তব অসীম-অপার ॥২॥

বিচিত্র কৌশল তব জগতরচনা।
কোথা আদি কোথা অন্ত নাহি তার সীমা
জল স্থল সমীরণ যেথায় নেহারি।
বিচিত্র কৌশল তব মরি মরি মরি !!৩॥

নিরাকার তুমি নাথ রচিছ আকার।
এ বিচিত্র সৃষ্টিলীলা বুঝে সাধ্য কার।
কোথায় নয়ন তব, জগত-নয়ন,
নাহি তব কর্ণ, তবু করগো শ্রবণ ॥৪॥

নাসিকা নাহিক, তবু নিতেছ হে ঘ্রাণ।
হস্ত নাহি তবু কর করি প্রসারণ,
করিতেছ নিশি দিন জগত পালন।
বিষম এ প্রহেলিকা কে জানে কেমন ॥৫॥

বল নাথ বল মোরে বল বিশ্বপতি।
কি হ'বে কি হ'বে নাথ মম শেষ গতি !
অন্তর্যামী তুমি বিভো, বিদিত তোমার।
সকলি হে বিশ্বনাথ, দিবে সমাচার ॥৬॥

করিওনা বিড়ম্বনা ধরি শ্রীচরণ।
অধীনীরে দেহ জ্ঞান, জগতজীবন।
দেহ জ্ঞান, করি দূর অজ্ঞানতিমির।
তোমার চরণে যেন রহে মতি স্থির ॥৭॥

দয়া কর দয়াময় সদয় হইয়া।
রাখ নিজ গুণে নাথ আপন তনয়া।
আজ কাল করি শেষ হইছে জীবন।
দাও প্রাণনাথ শিরে তব শ্রীচরণ ॥৮॥

প্রেমময়, শান্তিময়, তুমি দয়াময়।
প্রেম শান্তি দেহ হৃদে তব তনয়ায়।
আজ কাল করি তনু হইল যে ক্ষয়।
তথাপি তোমার কৃপা নাহি কেন হয় ॥৯॥

ও চরণ আশে নাথ রয়েছে জীবন।
বল দয়াময় কিসে পাব দরশন।
হৃদয়পঙ্কজে সদা করিছ বিরাজ।
নেহারিব কবে নাথ! ও পদসরোজ ॥১০॥

মনোভৃঙ্গ বসি কবে ও পদপঙ্কজে,
হবে মত্ত মধুপানে গুঞ্জিবে হরষে।
কবে এ বাসনা পূর্ণ হবে দয়াময়,
জীবিতেশ অনুরোধ আশার আশায় ॥১১॥

শ্রীমতীঅমিয়বালা ঘোষ।

প্রেম।

(১)

অসীম গগনস্পর্শী হিমাচল সম
স্থির, ধীর, সুগম্ভীর অচঞ্চল তুমি,
বিবাদ, বিপদ-বজ্র না পারি টলাতে
লভি পরাজয় ফিরে নতশিরে চুমি।
বিচ্ছেদ, বিরহ, দৈন্য, পরিহাস-ঝঞ্ঝা
না পারে টুটিতে তব সুদৃঢ় বাঁধন,
যাতে বিঘাতনে আরো জীবন্ত উজ্জ্বল
হও যেন অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চন যেমন।

পবিত্র, বিমল, তুমি স্বর্গীয় সুন্দর,
না পশে শ্রবণে তব ভব-কোলাহল,
শান্ত, স্নিগ্ধ, সুমধুর, ত্রিদিব অমিয়া
তোমারে ঘেরিয়া সদা করে ঝলমল।
লভিয়া তোমারে চিতে হে চির-নবীন।
আত্মহারা, মাতোয়ারা ভাবুক-জীবন,
মোহন প্রকৃতি তব, তাই তো নয়নে
ধরায় অমর হেরে প্রেমিক যে জন।

"শিশির"-রচয়িত্রী, ছনহরা।

বাসনা।

প্রভু! কবে ফুরাইবে মোর
জীবনের-অনন্ত যাতনা,
কবে নির্ব্বাপিত হবে, এই ঘোর
বাসনার সুতীব্র তাড়না,
অণু পরমাণু হ'য়ে
কবে ওচরণছায়ে
চির তরে হয়ে যাব লীন,
লভিবারে অনন্ত সান্ত্বনা।

বিষয় সম্পদ দিয়ে প্রভু!
আর মোরে ক'রোনা ছলনা,
ডেকে লও প্রভু! মোরে
তোমার স্নেহের ক্রোড়ে
ভুলে যাই, মরতের এই
সুখ দুঃখ বিষাদ ভাবনা।
তুমি সদা হৃদয়ে জাগিবে
এই মম অনন্ত বাসনা।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

মিনতি।

শ্মশান গো! খুলে দাও
নিরুদ্ধ দুয়ার,
একবার দেখে যাই
দাদারে আমার!
সে যে আমাদের ছেড়ে,
তব স্নিগ্ধ কোলে
অনন্ত শান্তির আশে
গিয়াছে মা! চলে।
সে যে ছিল আমাদের
সাধনার ধন।
তুমি মা। নিয়েছ তারে
করিও যতন।

স্নেহের আঁচলে ঢাকি
রাখিও তাহারে,
এ মিনতি দয়াময়ি!
রেখ দয়া ক'রে।
নীরবে সমাধিপাশে
আসিব যখন,
জননী গো! দেখাইও
তাহারে তখন।
ফিরে যাই আজি তবে
লয়ে শ্রান্ত মন,
রেখ মা! যতন করি
দরিদ্রের ধন!

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।

হে সাধু, হে পুণ্যবান্, দেশের গৌরব,
তেয়াগিয়া কর্ম্মস্থলে, তুমি কি গিয়াছ চলে,
লভিতে সঞ্চিত তব স্বর্গীয় বিভব?
গিয়াছ কি নিজধামে, ধর্ম্মপত্নী লয়ে বামে,
মিলিয়াছ মহাপদে শান্তির ছায়ায়?
তুমি সাধু যোগিবর, সেই শান্তি নিরন্তর
তোমার হৃদয়ে ছিল বিমল বিজয়।
চিরদিন আলোকিত, ব্রহ্মানন্দে বিভূষিত,
আবরিত ঘোরতর সংসার শঙ্কায়,
কর্ত্তব্য সাধিয়া ধীরে, আত্মপ্রসাদের নীরে,
ডুবেছিলে চিরদিন ব্রহ্মসাধনায়।
বিষয়ের মমতায়, সুখ দুঃখ নিরাশায়,
ঐ মহাশুদ্ধ প্রাণ ছিল না চঞ্চল,

ঘটনার ঝটিকায়, সুদৃঢ় অটল কায়,
ধরেছিলে জননীর অভয় অঞ্চল।
বিতরিয়া বন্ধুগণে, নিজ প্রিয় পরিজনে,
সে মহারতন-কণা ছায়া জীবনের,
চিত্তক্ষেত্রে চিরাঙ্কিত, পবিত্র ভাবে পূরিত,
দিয়ে গেছ তব স্মৃতি চির আদরের।
সংসারে যোগীর প্রায়, মুক্ত আত্মা অবস্থায়,
কে এমন সাধুবর জন্মেছে ধরায়,
কে এমন জ্ঞানিভাবে, ধনী দীন সমভাবে,
ঢালিয়াছে ভালবাসা অজস্র ধারায়।
ত্যাগ স্বীকারের ভাব, এমন কোন্ স্বভাব,
অকাতরে ক্লেশভার করিতে বহন,
সাধু কার্য্যে দিয়ে প্রাণ, ফুল্লচিত্ত বলবান,

কে হবে তেমন আর তোমার মতন।
কর্ম্মক্ষেত্রে যার সনে, ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রাণে মনে,
যেই বান্ধবের মর্ম্ম করিতে গ্রহণ,
সাথে সাথে তাঁরি পরে, চলে গেলে নিজ ঘরে,
আঁধার করিয়া হার ব্রাহ্মভ্রাতৃমন।
তনয়া তনয় তব, কাঁদিছে অকালে সব,
বহুদিন মাতৃহারা কোলেতে তোমার,
শান্ত কর প্রিয়গণে, স্নেহাশীষ বরিষণে,
দিয়া এ জীবনমাঝে ও জীবন সার।
হউক প্রতিফলিত, জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত,
বিনম্র হৃদয় আর বিশুদ্ধ আচার,
পবিত্র হৃদয়ভূষা, বিমল জ্ঞানের ঊষা,
ভাসে যেন নিরন্তর অন্তরে সবার।

সঙ্গীহারা।

চারি বছরের ক্ষুদ্র দেহ মন
জ্ঞান বুদ্ধি তাহে অতীব ক্ষুদ্র।
ভাল মন্দ কিছু জানে না বুঝে না,
চিনেনা ত সে ভদ্র কি অভদ্র।
হাসিত, খেলিত, খাইত, শুইত,
জননীর স্নেহবুকের মাঝে।
মরতে স্বরগ ছিল গো তাহার,
সদা সুখময় সুখেরি সাজে।
আজি কেন তার উপজিল দুখ,
কেন গো কাঁদে এত অকারণে।
নাহিক আরাম জননীর কোলে,
নাহিক তৃপ্তি সে সুধাপানে।
কত ছল করি এ ঘরে ও ঘরে,
খুঁজিয়া বেড়ায় আহা সে কারে।
কার অদর্শনে সে ক্ষুদ্র পরাণে,
কোন্ বেদনায় আঁখিটি ঝরে?
না মানে সান্ত্বনা আকুল পরাণ,
না খায় ঔষধ যতন করে,
কোমল মুকুলে দংশিল কি কীট,
হলো না কি দয়া তাহার মনে।
কেড়ে নিল তার আজনম সাথী,
বিচ্ছেদ ঘটাল বোন্‌টি সনে।
সমানবয়স্কা ভগিনী তাহার,
গিয়াছে ত্যজিয়া কার্ত্তিক প্রাতে
আর আসিবে না খেলিতে হেথায়,
ক্ষুদ্র বন্ধু লয়ে দিবস রাতে।
পূরব গগনে উদিয়াছে ভানু
রঞ্জিয়া আবার ধরণী গেহ।
আলোকে পূরিল ফিরে দশদিক
সজীব হইল লভিয়া স্নেহ।
শুধু সেই স্থান রহিল আঁধার
যেথায় খেলিত সেই শিশু দুটি,
একটি গিয়াছে সকালে চলিয়া
একটি আঁধারে রয়েছে ফুটি।

শ্রীমনোজবা-রচয়িত্রী।

১৬।৩ মধু রায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 576. August, 1911.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৭৬ সংখ্যা। } শ্রাবণ, ১৩১৮। আগষ্ট, ১৯১১। { ৯ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের অভ্যর্থনায় ছাত্র ও ছাত্রী—যে দিন রাজা ও রাণী কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন, সেই দিন রেড রোডের পার্শ্বে ২৪ সহস্র ছাত্র এবং ছাত্রীকে সমবেত করা হইবে। ৮ বৎসরের ন্যূন কিম্বা ১৪ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে না। প্রত্যেক স্কুলের পৃথক্ পৃথক্ পতাকা থাকিবে। কলিকাতার কোন্ স্কুল হইতে কত ছাত্রী উপস্থিত হইবে, তাহার সংখ্যা করা হইতেছে।

২। কংগ্রেসের সভাপতি—এ বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেস সভার অধিবেশন হইবে। তাহাতে পার্লামেণ্টের সভ্য ভারতহিতৈষী মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ড মহাশয়কে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। ইহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন, এরূপ আশা করা যায়।

৩। ভূপালের বেগম সাহেবা—ভূপালের বেগম সাহেবা রাজা পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন। ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি সম্প্রতি কনষ্টাণ্টিনোপলে অবস্থান করিতেছেন। মুসলমান মহিলাদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিলাতগমন করিলেন।

৪। মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচ্—কলিকাতার গড়ের মাঠে ইষ্টইয়র্কশায়ারের সহিত মোহনবাগান ফুটবল্ খেলওয়াড়দিগের যে খেলার বাজী হইয়াছিল, তাহাতে দর্শকদিগের নিকট ৬৯১৪৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে।

এই টাকা দাতব্য ফণ্ডে দান করা হইবে, শুনা যাইতেছে। ইহা অতি আনন্দের বিষয়।

৫। বেথুন-স্মৃতি-সভা—পরলোকগত মহাত্মা-ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেবের স্বর্গারোহণের দিনে বেথুন কলেজ-গৃহে তাঁহার সম্মানার্থ এক সভা আহূত হইয়াছিল। তাহাতে ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী মহাশয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র প্রভৃতি সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত থাকিয়া মহাত্মা বেথুন সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নারীহিতৈষী বেথুন সাহেব স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ভারতরমণীগণ এ জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জীবিকার উপায়।

আজকাল আমাদের দেশে নারী জাতির কর্ম্মের জন্য দুই চারিটী নূতন পথ খোলা হইতেছে, ইহা অতিশয় শুভ চিহ্ন। ঐরূপ কাজের নিমিত্ত ভারতমহিলাদের যে উপযুক্ত সময় হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বহুদিন হইতে হিন্দু মহিলাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য যাঁহারা ধনী লোকের স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব দাস দাসীতে সর্ব্বদা বেষ্টিত থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই আদর যত্নে জীবন কাটান। কিন্তু অভিভাবকহীন হইলে ভদ্র গরীব স্ত্রীলোকদিগকে জীবিকার জন্য যে কত ঘৃণা ও অবমাননা সহিতে হয়, তাহা ভাবিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। অভিভাবক হারাইলে কোন আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া থাকা বা পাচিকা-বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা ব্যতীত ভদ্র বংশের অনাথাদের আর কোনও উপায় থাকে না। ঐরূপ অবস্থায় আত্মীয় স্বজনের বা পরের দাস্য করায় তাঁহাদের মনে যে কতদূর লজ্জা ও অপমান বোধ হয়, তাহা ঐ প্রকার অবস্থায় না পড়িলে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

সুখের বিষয়, এখন দরিদ্র ও বিধবা নারীদিগের কার্য্য করিবার নিমিত্ত, কার্য্যক্ষেত্রে দুই একটী নূতন উপায় হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ঐ অভিনব উপায়গুলি নিজেদের উপযোগী করিয়া লইবার পক্ষে অবরোধপ্রথা এক মহা প্রতিবন্ধক। ডাক্তার, ধাত্রী বা হাঁসপাতালের সেবিকা হইতে হইলে

বাহিরে যাইতে হয়, যখন তখন অন্তঃপুর হইতে অন্য স্থানে যাওয়া আসা করিতে হয়, এবং প্রকাশ্যে পুরুষের সম্মুখে বাহির হইয়া পরীক্ষা দিতে হয়—ঐ সকল কারণে উহা এখন সকল হিন্দু নারীদিগের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। আর আমরা যতদিন বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিব, ততদিন উহাদ্বারা ভারতমহিলাদিগের জীবিকার আশা করা বৃথা। ভাগ্যক্রমে অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের নিঃস্ব বিধবারা সচরাচর একেবারে অনাথা হইয়া পড়েন না; তাঁহাদের পিতা, ভ্রাতা বা অপর কোন আত্মীয় তাঁহাদিগকে নিজ পরিবারে রাখিয়া ভরণপোষণ করেন এবং বিধবারাও উহার জন্য তাঁহাদের গৃহকর্ম্ম সকল করিয়া কাল যাপন করেন। অধিকাংশ স্থলে ঐরূপ জীবন বিধবার পক্ষে কষ্টকর না হইয়া বরং সুখের হয়। কিন্তু যাঁহাদের সংসারে আপনার বলিতে কেহ নাই, বা যাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে বিমুখ বা অপারক, তাঁহাদের জীবনে কি রাঁধুনীগিরি করা বই আর কোন জীবিকার উপায় নাই? অবশ্য আছে। কিন্তু জীবিকার সে উপায় বাল্যকালের শিক্ষার উপরই নির্ভর করে। সেই কারণে গৃহস্থ পিতামাতারা বালিকাদিগকে যাহাতে কোন না কোন শিল্প কার্য্যে বা ব্যায়ামে সুশিক্ষিতা করিতে পারেন, সে বিষয়ে যেন যত্নের ত্রুটি না হয়।

ভবিষ্যতে কাহার জীবনে কি ঘটিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না, সেইজন্য জীবনের প্রারম্ভ হইতেই বালিকাদিগকে সকল প্রকার বিপদ আপদের জন্যও প্রস্তুত করা কি সুবুদ্ধি ও স্নেহশীল পিতা মাতার কর্ত্তব্য নয়? বাল্যকাল হইতে কন্যাদিগকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দাও, সকল কাজ নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিতে শিখাও। দেখো, যেন তাহারা কোন কাজ অর্দ্ধেক শেষ করিয়া ফেলিয়া না রাখে, বা কোন দ্রব্য মন্দরূপে প্রস্তুত না করে। যে কোন কাজ হউক, বাল্যকালে উহাতে নিয়মিত শিক্ষালাভ হইলে পরজীবনে উহাদ্বারা নিশ্চয়ই জীবিকা উপার্জ্জন করিবার সুবিধা হইবে।

বাল্যকালের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অনুশীলন ও অভিনিবেশের অভ্যাস প্রাপ্তবয়সে আমাদের জীবনের প্রধান সম্বল হয়। তাহা হইলে আমরা শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া উপস্থিত বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিলে বা দুর্ভাগ্যক্রমে অসহায় হইয়া পড়িলে, আর সংসারে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হয় না। দুঃখ যন্ত্রণা তখন আমাদিগকে দুর্ব্বল করিবার পরিবর্ত্তে অধিকতর দৃঢ় করে, কাজ আমাদের সান্ত্বনা স্বরূপ হয়। আমরা নিজেই পরিবারের কাণ্ডারী হইয়া আবার দাঁড় বাহিয়া চলিতে পারি, আমাদের অনাথ ভাইভগ্নীগণ আশ্রয় পায়, শিশুসন্তানেরা আহার পায় ও আত্মীয়গণ আমাদিগকে সম্মান করিয়া চলে।

দুইটী বন্ধু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মের ছুটী ফুরাইয়া গেল, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আবার সকলে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। আমাদের সুরেশচন্দ্রও আসিয়া ভূপেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইলেন। সুরেশকে নিকটে পাইয়া ভূপেন্দ্রনাথ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। সুরেশচন্দ্রের নিকট সকল কথা অকপটে ব্যক্ত করাতে তাঁহার হৃদয়ের ভারের লাঘব হইল।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন "ভাই, এ জগতে কেবল স্বার্থ, এখানে প্রেম নাই, ভালবাসা নাই, দয়া ধর্ম্ম নাই, এখানে মানবের সাধ ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন! লোকে কেবল স্বার্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, স্বার্থ ভিন্ন পরার্থে কেহ কখনও কোন কার্য্য করিতে চাহে না। এমন কি স্বার্থের জন্য পিতামাতাও আপন সন্তানের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না।

তাহার প্রমাণ, তোমার পিতাকেই দেখ। তোমার জীবনের সুখশান্তি সকল নষ্ট করিয়া, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার বিবাহ দিয়া, তিনি বিপুল অর্থ হস্তগত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন "এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কি কোনও উপায় নাই?"

সুরেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কি বলিব? পিতার অবাধ্য হওয়া কুলাঙ্গার পুত্রের কার্য্য। সৎপুত্র সর্ব্বদা নতশিরে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার তুল্য মহাগুরু জগতে কে আছেন?

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥'

অতএব পিতৃ-আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়।"

ভূপেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন "তবে তুমিও কি বল ১৫ হাজার টাকার জন্য ঐ কাণা মেয়ে বিবাহ করিব? টাকা লইয়া বিবাহ করা আমি চির দিনই ঘৃণার চক্ষে দেখি। তাহার পর তোমার নিকটে যে অবধি তোমাদের সকল কথা শুনিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি যে, কখনও টাকা লইয়া বিবাহ করিব না। এই প্রথা উঠাইবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, আর আমিই টাকা লইয়া বিবাহ করিলে লোকে আমায় কি বলিবে? আমি যদি নিজে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া বিবাহ করি, তবে অপরকে কি প্রকারে সদৃষ্টান্ত দেখাইব? আমি নিজেই যদি কুকার্য্য করি, তবে অপরকে

কিরূপে সদুপদেশ দিব? আর কেই বা আমার কথা শুনিয়া কার্য্য করিবে? নিজে সৎ না হইলে অপরকে কখনও সৎপথে আনা যায় না। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে সক্ষম হয়?

এ পর্য্যন্ত কোন দিন পিতৃবাক্য অবহেলা করি নাই, কিন্তু এখন আমি যে কি করিব, তাহা আমার চিন্তার অতীত, তাই তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি। তুমিও কি এখন টাকা লইয়া এ বিবাহ করিতে বল?"

সুরেশ একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "ভূপেন্! এ যদি দরিদ্রের কন্যা হইত, এবং অর্থাভাবে 'কাণা' বলিয়া লোকে ঘৃণা করিয়া উহাকে বিবাহ করিতে না চাহিত, তাহা হইলে আমি তোমায় ইহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতাম। কিন্তু যখন এই কন্যা প্রভূত ধনের উত্তরাধিকারিণী, এবং এই ধন-লাভের নিমিত্ত অনেকে ইহাকে বিবাহ করিতে লালায়িত হইয়াছে, তখন এ স্থলে যে তুমি ইহাকে বিবাহ কর, এমন ইচ্ছা আমার কখনই হইতে পারে না। তোমার মতামত সম্বন্ধে তোমার পিতাকে কোনও কথা বলিয়াছিলে কি?

ভূপেন্দ্র। না, তিনি যখন আমার মতামত সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, তখন আমি তাঁহাকে এ বিষয়ে কি বলিব?

সুরেশ। আমার বিবেচনায় তাঁহাকে একবার বলিয়া দেখা ভাল।

ভূপেন্দ্র। না ভাই, তাঁহাকে কোনও কথা বলিতে আমার সাহস হয় না, এবং তাঁহাকে বলিলেও কোন ফল হইবার আশা নাই। আমি মনে মনে একটা পরামর্শ স্থির করিয়াছি, অবশেষে তাহাই করিব।

সুরেশ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি পরামর্শ?"

ভূপেন্দ্র। পলায়ন।

সুরেশ। সে কি? কোথায় পলাইবে?

ভূপেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "আমি মনে ভাবিয়াছি যখন এই বিবাহের সময় উপস্থিত হইবে, আমি তখন দুষ্ট বালকের ন্যায় এক দিকে চলিয়া যাইব।"

সুরেশ বলিলেন, "না ভাই, এ কথা ন্যায়সঙ্গত নহে। বিবাহের সময় তুমি পলাইয়া যাইবে, আর সেই নিরপরাধা বালিকার জাতিনাশ হইবে। সমাজের চক্ষে, ধর্ম্মের চক্ষে সে পতিতা হইবে, এমন কাজ করিও না।"

ভূপেন্দ্র। আমি এরূপ পাষণ্ড নহি যে, যাহাতে সে বালিকার কোন অনিষ্ট হয়, এমন কার্য্য করিব! তাহার অপরাধ কি?

পিতা অগ্রহায়ণ মাসে আমার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন, আমি তৎপূর্ব্বে কোথাও চলিয়া যাইব; অবশ্য যখন যাইব, তোমাকে বলিয়া যাইব।

সুরেশ একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নহে বটে, কিন্তু আমার

মতে, একবার তোমার পিতাকে সকল কথা খুলিয়া বলা উচিত। একান্তই যদি তিনি তোমার কথায় অসম্মত হন, তখন যাহা ইচ্ছা হয় করিও।"

ভূপেন্দ্র কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "পিতাকে বলিলে কোনও ফল হইবে না, বরং মাতাকে একবার বলিয়া দেখিব।"

ইহার কয়েক দিবস পরে এক দিবস অপরাহ্ণে ভূপেন্দ্রনাথ মাতার নিকট বসিয়া জলযোগ করিতেছিলেন। হরিমোহন বাবু যে প্রকৃতির লোক, গৃহিণী সেরূপ ছিলেন না, তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধি একটু সুমার্জ্জিত এবং প্রাণে একটু স্নেহ মমতা ছিল। তিনি হরিমোহন বাবুর ন্যায় কেবলই "বিষয়" চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন না, সন্তানগণের সুখ দুঃখ দেখিতেন।

ভূপেন্দ্রনাথ ইদানীং চিন্তা-স্রোতে দেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কিসে স্বদেশের ও সমাজের হিতসাধন করিবেন, কিরূপে সমাজ হইতে কন্যার পন উঠাইতে পারিবেন, এই তাঁহার হৃদয়ের মূল মন্ত্র হইয়াছিল! তিনি নিজেও কি প্রকারে এই বিবাহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন, সে চিন্তাতেও কাতর ছিলেন। এখন আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় বেশবিন্যাসে যত্ন নাই, পরিচ্ছদপারিপাট্যে ইচ্ছা নাই। মস্তকের কেশগুলি সর্ব্বদাই অবিন্যস্ত থাকে। তাঁহার সুন্দর বদনমণ্ডলে ঈষৎ কালিমার রেখা পড়িয়াছে এবং গৌর কান্তিও অল্প ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে।

গৃহিণী পুত্রের এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোনও কারণ অনুসন্ধান করিয়া পান নাই। জিজ্ঞাসা করিলে ভূপেন্দ্র "কিছুই হয় নাই" বলিয়া উত্তর দেন। গৃহিণী ভাবিয়াছিলেন "বোধ হয় পাঠের জন্য রাত্রিজাগরণ করিয়া পুত্রের এরূপ হইতেছে।"

অদ্য তিনি পুত্রকে জলখাবার দিয়া, একখানি তালবৃন্ত লইয়া নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে পুত্রকে বাতাস করিতেছিলেন। তাহার পর পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "হাঁ বাবা, চুলগুলি যে জটা বেঁধে যাচ্ছে, আঁচড়াও না কেন?"

ভূপেন্দ্র ঈষৎ বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "যমের বাড়ী গিয়ে আঁচড়াব।"

শুনিয়া গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "বালাই, ষাট্, ও কথা কি বলতে আছে বাবা, তুমি আমার রাজ্যেশ্বর! তোমার কিসের অভাব?"

ভূপেন্দ্র কিঞ্চিৎ অভিমানসূচক স্বরে কহিলেন "হাঁ,—অভাব নাই বলিয়াই ১৫ হাজার টাকায় একটা কাণা মেয়ের বাপের কাছে আমায় বিক্রয় করিবে?"

গৃহিণী চমকিত হইলেন। তিনিও এক এক বার এই বিবাহের কথা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, এবং এমন ছেলের "কাণা বৌ" হবে ভাবিয়া কিছু ক্ষুণ্ণও হইতেন, কিন্তু আবার অগাধ বিষয় সম্পত্তি পাইবার কথা ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন।

পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "সে কি বাবা, ও কথা কি বল্‌তে আছে? সেত তোমার দাসী আসিবে, তার বাপের কাছে তোমার বিক্রি আবার কি?"

ভূপেন্দ্র। বিক্রি নয়ত কি মা? এতগুলি টাকা লইয়া তবেত তাহার সহিত আমার বিবাহ দিতেছ? সে দাসী নহে, প্রকৃত পক্ষে আমিই তাহার ক্রীতদাস হইব। তুমি বল দেখি মা, যদি তাহার বাপ এই অর্থরাশি দিতে সক্ষম না হইতেন, তবে কি ঐ কাণা মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে?

গৃহিণী। তা' কেন দেব? বিষয় সম্পত্তির জন্যই তো' কর্ত্তা ওখানে বিবাহের কথা স্থির করিয়াছেন।

ভূপেন্দ্র। ছিঃ—পরের ধনে লোভ করা অধর্ম্মের কার্য্য! টাকা লইয়া ছেলের বিবাহ দেওয়া কতদূর ঘৃণিত কর্ম্ম, তাহা তোমরা বোঝ না! ইহাতে সমাজের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে।

গৃহিণী। তা' বাছা আমরা তো' আর একা নিচ্ছিনে, সকলেই তো' আজকাল এই রকম নিচ্ছে।

ভূপেন্দ্র। ঐ তো হয়েছে দোষ! 'অমুক কচ্ছে, আমিও করিব'। কিন্তু মা, সকলে যদি কুকার্য্য করে, তোমাকেও কি কুকার্য্য করিতে হইবে? তোমাকেও কি মা, কোনও সৎকর্ম্ম করিতে নাই? আর দেখ মা, সকল লোকেরই অভ্যাস, দেখাদেখি কার্য্য করা। আজ যদি তুমি একটী সৎকর্ম্ম কর, তবে তোমার দেখিয়া কাল আর একজন তাহা করিবে। তাহা দেখিয়া অপর একজন করিবে, এইরূপে জগতের অনেক দুষ্কর্ম্ম দূর হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সদনুষ্ঠান হইতে পারে।

গৃহিণী। তা বাবা, আমরা মেয়েমানুষ, আমরা আর কি সৎকর্ম্ম করিতে পারি?

ভূপেন্দ্র। কি সৎকর্ম্ম করিতে পার? তোমরা না পার কি মা? স্ত্রীলোকের ন্যায় সদ্‌গুণ অনেক পুরুষের নাই। স্ত্রীলোকের ধর্ম্মবিশ্বাস, স্ত্রীলোকের সহিষ্ণুতা পুরুষ অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক! স্ত্রীলোকের স্নেহ মমতা অপারনীম। যাহারা 'মেয়েমানুষ' বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহারা দাম্ভিক মাত্র! তোমরা যদি মা, আগ্রহপূর্ব্বক কোনও সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ কর, তবে অবশ্যই তাহা সফল হইবে। আর দেখ মা, টাকা লইয়া পুত্রের বিবাহ দেওয়ায় যে পাপ হয়, তাহা বেশ বোঝা যায়, কারণ, কত গৃহস্থের ইহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে। দুই চারি জন ধনী লোক ছাড়া কন্যার বিবাহে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে কেহই সক্ষম নহে। কিন্তু কন্যার বিবাহ দিতে হইলে সকল লোকেরই অর্থ চাই, সুতরাং ঋণ করিয়া হউক বা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া হউক, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইতে হইবে। এইরূপ অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দিলে অধর্ম্ম হয় না? ধিক্ সমাজকে, আর সহস্র ধিক্ আমাদিগকে যে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও

আমাদের জ্ঞান জন্মে না, আমাদের দয়াও হয় না!

ভূপেন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনিয়া গৃহিনীর অন্তরে প্রকৃতই আনন্দ জন্মিল। তিনি হরিমোহন বাবুর ন্যায় একেবারে অন্তঃসারশূন্যা হৃদয়হীনা রমণী ছিলেন না। হায়! আজি কাল হরিমোহন বাবুর ন্যায় স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে, তাই আজি বাঙ্গালার কন্যা-কর্ত্তারা কন্যা লইয়া প্রমাদ গণিতেছেন।

গৃহিণী মিষ্ট স্বরে পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, "তা' তুমি কি করিতে বল?"

ভূপেন্দ্রনাথ একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমার কথা কি আর তোমরা শুনিবে?"

পুত্রের ম্লান মুখ দেখিয়া তাঁহার বড়ই কষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন, "যাক্ টাকা, আমার ভূপেন যাহাতে সুখী হয়, তাহা আমাকে করিতেই হইবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, আমার নিকট তোমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বল, লজ্জা করিও না।

ভূপেন্দ্র বলিলেন—আমার ইচ্ছা আমি ঐ কাণা মেয়েকে বিবাহ করিব না, এবং অন্য কোথাও টাকা লইয়া বিবাহ করিব না। এই কথা বলিয়া ভূপেন্দ্রনাথ মাতার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া সান্ধ্য বায়ুসেবনার্থে বরাবর গঙ্গার ধারে গমন করিলেন। একাকী লক্ষহীন হইয়া চলিলেন, ভাবিলেন বাহিরের বায়ুসেবনে হয়ত একটু তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু হায়! তাঁহার চিন্তাস্রোত কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে।

এ দিকে গৃহিণী যথাসময়ে হরিমোহন বাবুর নিকট ভূপেন্দ্রনাথের মনোভাব জানাইলেন, নিজেও "কাণা পুত্রবধূ না হয়," একটু অনুরোধ করিলেন?

তিনি কহিলেন "অমন ছেলের আবার বিবাহের ভাবনা? আমার হিরার টুকরো ছেলে! আর কাণা বৌ হবে! কি ঘেন্নার কথা, তুমি একটী ভাল মেয়ে দেখ।"

গৃহিণীর এই কথা শুনিয়া হরিমোহন বাবু একেবারে "তেলে বেগুনে" জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন "কি? এমন সম্বন্ধ ভূপের পছন্দ নয়? ভূপেটা একেবারে অধঃপাতে গেছে। তার হিতাহিতজ্ঞান রহিত হইয়াছে! এখনকার ছেলেগুলো দু'পাতা ইংরাজী পড়ে একেবারে ব'য়ে যায়, লজ্জা সরম নাই, পিতামাতার নিকটে অম্লানবদনে বিবাহের কথা বলে! ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা! অমন একটা হাকিমের একমাত্র জামাই হবে, ভবিষ্যতে তার সকল বিষয়ের মালিক হবে, একি কম সৌভাগ্য নাকি? এমন কি লোকের ভাগ্যে ঘটে? আমি অনেক ভেবে তবে এ সম্বন্ধ স্থির করেছি। তোমরা 'কাণা' 'কাণা' করে অস্থির হচ্ছ। সেত অন্ধ নয়! আর যদি সে অন্ধও হইত, তথাপি তাহার বিবাহের ভাবনা থাকিত না। সে যে সম্পত্তির মালিক, কত বড় লোকের ছেলে তার লোভে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য উমেদারি করিতেছে। ভূপে'র ভাগ্য

ভাল যে সে বিনোদ বাবুর জামাই হবে। তোমরা মেয়ে মানুষ বোঝ কি?" হরিমোহন বাবু বড় রুক্ষস্বরে এই কথাগুলি বলিলেন। বলিতে পারি না, যদি তিনি শান্তভাবে গৃহিণীকে এই কথা বুঝাইতেন, তাহা হইলে কি ফল হইত! কর্ত্তার রুক্ষ ভাষা শ্রবণ করিয়া গৃহিণীও বড় চটিয়া গেলেন এবং রাগান্বিত হইয়া উত্তর দিলেন "তোমার নিজের বিষয়ের অভাব নাই, ভূপেন যদি বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তবে অমন বিষয়ে দরকার কি? যার জন্য বিষয়, সেই যদি বিষয় নিয়ে সুখী না হয়, সেই যদি বিষয়ের লোভে কাণা মেয়ে বিবাহ করিতে না চায়, তবে জোর ক'রে কাণা মেয়ের সঙ্গে তার বে' দাওয়া কেন?"

কর্ত্তা মহাক্রুদ্ধ হইলেন। রাগ হইলেই তাঁহার কটীর বস্ত্র খসিয়া পড়িত। তিনি বস্ত্র পরিধান করিতে করিতে কহিলেন, "একশ' বার 'কাণা' 'কাণা' কোরনা বলছি! আমার যা খুসী তাই করিব, আমার ছেলের আমি বিয়ে দেব, তুমি কথা কইবার কে?"

গৃহিণীরও ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "বটে, তোমারি ছেলে, আর আমার কেউ নয়? আচ্ছা, আমিও বল্‌ছি কখনই তুমি ওখানে আমার ভূপেনের বে' দিতে পারবে না।"

হরিমোহন। নিশ্চয়ই দেব। কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা রদ করে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা দিয়ে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না। বিশেষতঃ ঐ নগদ টাকাটায় চোরবাগানে একখানা বাড়ী কিন্‌বো ঠিক করে রেখেছি। বিনোদ বাবু এখনি আমায় ১৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন, আমি কেবল ভদ্রতার অনুরোধে এখন লই নাই, বিবাহের রাত্রে লইব বলিয়াছি। কটা মাস গেলে বাঁচি, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই লগ্ন স্থির করিব। যে তোমরা পেছু লেগেছে, আর দেরি করা হবে না।

গৃহিণী কর্ত্তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শুনিয়া একটু ভীত হইলেন এবং কাতরস্বরে বলিলেন, "দেখ তুমি আর পাঁচটা ছেলের বে' দিয়েছ, যা-ইচ্ছা করিয়াছ, আমি কোনও কথা বলি নাই, বাড়ী কিন্‌তে হয়, তোমার নিজের টাকায় কেন, তোমার পায়ে পড়ি, ভূপেন যদি ওখানে বে' ক'রে অসুখী হয়, তবে তার ওখানে বে' দিও না। আমারইযেন্না হ'চ্ছে যে, অমন ছেলের কাণা বৌ হবে, লোককে কি ক'রে বৌ দেখাব?"

হরি। কি? আবার "কাণা" "কাণা" কোচ্ছ?

গৃহিণী। খুব কচ্ছি, কাণা তা' কাণা বোল্‌বো না?

হরি। আমি যদি হরিমোহন দত্ত হই, তবে নিশ্চয় ঐখানে ভূপেন'র বে' দেব, কারো কথা শুনবো না।

গৃহিণী। ভগবান্ সাক্ষী, আমি যদি যথার্থ তোমার ধর্ম্মপত্নী হই, তবে কখনই ওখানে ভূপেনের বে' দিতে দেব না।

এই বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

(৬)

আশ্বিন মাস। শারদীয় মহৎসবে বঙ্গভূমি আনন্দোচ্ছ্বাসে উল্লাসিত হইয়া উঠিয়াছে, মুমূর্ষু বাঙ্গালিকুল আজি যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। আফিষ, স্কুল, কলেজ সব বন্ধ হইল, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে গৃহগমনের উদ্যোগ করিতেছে। আফিষের বাবুরা পূজার বাজার করিবার নিমিত্ত ব্যস্তভাবে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে ফর্দ্দ হাতে করিয়া এ দোকান, ও দোকান করিতেছেন। সকলেই নিজ নিজ পুত্র, কন্যা, জামাতা প্রভৃতির জন্য মনোমত বসনভূষণ ক্রয় করিতেছেন। বঙ্গ রমণীকুল এই সময়ে পতি পুত্রের মুখ দর্শন করিতে পাইবে বলিয়া আনন্দে ও উৎকণ্ঠিতচিত্তে দিন গণিতেছেন।

সুরেশচন্দ্রেরও কলেজ বন্ধ হইল, কিন্তু তাঁহার গৃহে যাইবার সেরূপ আগ্রহ বা আনন্দ নাই। তাঁহাদের সেই দারিদ্র্যনিপীড়িত, দুঃখক্লিষ্ট পরিজনের কথা মনে করিয়া তিনি সর্ব্বদাই দুঃখিত। তাঁহার পিতার সেই বিষাদাচ্ছন্ন বদনমণ্ডল, জননীর কষ্টসহিষ্ণু, নির্ম্মল প্রতিমূর্ত্তি, ভগ্নীগণের মলিন বেশ, এ সকল দেখিলে তাঁহার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়, সেই কারণে তিনি গৃহে যাইতে বিশেষ ইচ্ছুক নহেন। আর তাঁহার গৃহই বা কোথা? এক প্রবাস হইতে অন্য প্রবাসে গমন মাত্র। কিন্তু তাঁহার মাতা পুনঃপুনঃ তাঁহাকে বর্দ্ধমানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহাতে তিনি কিছু চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

মাতার মনে যাহাতে কষ্ট হয়, সুরেশ এমন কার্য্য জীবনে কখনও করেন নাই। তাই তিনি কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় ভূপেন্দ্রনাথ সুরেশচন্দ্রের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভূপেন্দ্রের বাটীর অতি সন্নিকটে, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটেই সুরেশের বাসা।

ভূপেন্দ্রনাথ আসিয়াই কহিলেন "চল সুরেশ, দিন কতক এক দিকে বেড়াইয়া আসা যাউক। ছুটীতে এরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে বড়ই কষ্ট হয়, কলিকাতায় আমার আদৌ মন টিকিতেছে না, চল দুদিন ঘুরিয়া আসি।"

সুরেশ। কোথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ?

ভূপেন্দ্র। ইচ্ছা কোথাও করি নাই, হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া স্থির করিয়া ফেলিব।

সুরেশ। সে কি কথা, কোথায় যাইবে পূর্ব্ব হইতে তাহা স্থির করিবে না?

ভূপেন্দ্র। তুমিই বল না কোথায় যাওয়া যাবে?

সুরেশচন্দ্র ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন "চল না দিন কয়েক বর্দ্ধমানে বেড়াইয়া আসিবে। সেখানেও দেখিবার অনেক জিনিষ আছে। কিন্তু ভাই আমরা নিতান্ত দরিদ্র, অতি সামান্য

গৃহে থাকি, এমন কি কুঁড়ে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তোমার ন্যায় ধনবান্ ব্যক্তির সে গৃহে বাস করা নিতান্ত কষ্টকর হইবে সন্দেহ নাই, তবে বন্ধু বলিয়া কৃপা করিয়া যদি—”

ভূপেন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন “ওকি কথা ভাই, তুমি আর আমি একইরূপ মনে করিও, ওরূপ কথায় আমি বড়ই দুঃখিত হই। অনেক দিন হইতে আমারও বাসনা ছিল যে, তোমার পিতামাতার চরণদর্শন করিব, আজি তাহা সফল হইল। চল কালই আমরা বর্দ্ধমানে যাইব।”

তাহাই স্থির হইল। তৎপরদিবস দুই বন্ধুতে হৃষ্টচিত্তে বর্দ্ধমানে গমন করিলেন। “বর্দ্ধমানে বেড়াইতে চলিলাম, দশ প'নের দিন সেখানে দেরি হইবে” বলিয়া ভূপেন্দ্রনাথ পিতামাতার নিকট বিদায় লইলেন। মধ্যে মধ্যে বন্ধুবর্গের সহিত তিনি এরূপ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

আজি প্রায় এক সপ্তাহ হইল ভূপেন্দ্র বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন। এই সপ্তাহকাল তাঁহার বড়ই শান্তিতে অতিবাহিত হইল। সুরেশের মাতার স্নেহ ও যত্ন, পিতার সদ্ব্যবহার ও সৌজন্য এবং ভগ্নীগণের অকৃত্রিম মমতা ভূপেন্দ্রনাথকে বিমোহিত করিল। ভূপেন্দ্র ভাবিলেন “যদি ভূতলে স্বর্গ থাকে, তবে সুরেশের এই গৃহ!” বাস্তবিক ইঁহাদের সংসার বড় শান্তিপূর্ণ। এখানে হিংসা দ্বেষ নাই, কলহ বিবাদ নাই, কপটতা নাই, সকলই সরলতাময়, এত যে দুঃখ দারিদ্র্য বাহিরে তাহার কিছুই কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। সুরেশের জননীর গুণে গৃহে শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে। সেখানে অশান্তির লেশমাত্র নাই।

সুরেশের জননী যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। তিনি সমুদায় গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে করেন। বাটীখানি সামান্য, মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়া দিতে হয়। অন্দরে দুইখানি শয়নগৃহ, একটা রন্ধনশালা, বাহিরে একটী বসিবার গৃহ। সকল ঘরগুলিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যৎসামান্য গৃহসজ্জা, কিন্তু তাহা পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কৃত।

সুরেশের মাতার নাম লক্ষ্মী। লক্ষ্মী যেন স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী! তিনি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। বুদ্ধিমতী, দয়াবতী, ধৈর্য্যশীলা, এবং সন্তানবৎসলা। এক অর্থ ছাড়া তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। পৃথিবীর যাবতীয় সদ্গুণরাশি যেন তাঁহার একায়ত্ত! এ দেশে বিধবাগণ সচরাচর যেরূপ ঘৃণাস্পদ এবং অনাদৃত হয়েন, তাঁহার নিকট সেরূপ দেখা যাইত না। তিনি পক্ষপাতহীন হইয়া সকলকে সমভাবে স্নেহ করেন। তিনি বলেন “বিধবারা সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত, অতএব তাহারা যাহাতে একটু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে, তাহা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে বাক্য দ্বারা বা অন্য কোনও প্রকারে যন্ত্রণা দিলে ভগবান্ অসন্তুষ্ট হয়েন।”

গৃহকর্ম্মান্তে তিনি কন্যাগণকে লইয়া রামায়ণ, মহাভারত বা শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করেন। সর্ব্বদাই সৎ কথা ও সৎ প্রসঙ্গ লইয়া তিনি গৃহকর্ম্মের অবশিষ্ট কাল কাটাইতেন। ভূপেন্দ্রনাথকে পাইয়া তাঁহারা সকলে বড়ই আনন্দিত হইলেন। সুরেশের মুখে পূর্ব্বে ভূপেন্দ্রের বহুতর প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এখন সেই ভূপেন্দ্রকে নিকটে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

ভূপেন্দ্রনাথ ও তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া বড় সুখী হইলেন। তিনি নিজেদের বাটীতে যেরূপ যত্ন পাইতেন না, সুরেশের বাটীতে তাহা পাইলেন। ভূপেন্দ্র ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান, তাঁহাদের বাটীর ধরণ করণ সমস্তই স্বতন্ত্র। সকল কার্য্যের ভার দাস দাসীর উপর নির্ভর করে। একত্রে, এক বাটীতে বাস, কিন্তু কেহ কাহারও সংবাদ প্রত্যহ পান না। সুরেশের মাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, নিজে নিকটে বসিয়া সযত্নে যে সামান্য শাকান্ন ভূপেন্দ্রকে খাইতে দেন, ভূপেন্দ্রের তাহা অতি উপাদেয় বোধ হয়। ভূপেন্দ্র মনে করিলেন, "সুরেশের মাতা স্বর্গের দেবী।" তিনি মনে ভাবিলেন, "আহা, এই পরিবার কত সুখী। আমি হতভাগ্য, যদি এইরূপ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে কত সুখী হইতাম।"

জগতের কি আশ্চর্য্য নিয়ম! আমার অবস্থা দেখিয়া অপরে প্রশংসা করিতেছে, কিন্তু আমি আমার সে অবস্থাকে অতিশয় দুঃখময় ও তৎপরিবর্ত্তে অপরের জীবন সুখময় মনে করি। আবার সেও হয়ত নিজের অবস্থাকে দুরবস্থা মনে করে। ভূপেন্দ্র ও সুরেশের ঠিক তাহাই হইয়াছে।

সুরেশ জানেন ভূপেন্দ্র জগতে অতুল সুখের অধিকারী। আবার আজি ভূপেন্দ্র ভাবিতেছেন "সুরেশই জগতে প্রকৃত সুখী।"

আর একটী সরলতার প্রতিমা দেখিয়া ভূপেন্দ্রনাথ একেবারে মুগ্ধ হইলেন। এটী সুরেশচন্দ্রের একাদশবর্ষীয়া কনিষ্ঠা ভগ্নী। বালিকাটিকে দেখিলে যথার্থই অন্তরে আনন্দ জন্মে। প্রস্ফুটিত চাঁপা ফুলের ন্যায় বর্ণ, শারদীয় শশীর ন্যায় মুখচন্দ্রমা, বিশাল পদ্মের ন্যায় চক্ষু—স্থির, কটাক্ষহীন, প্রকৃতিদর্পণে সেরূপ শোভা অতুলনীয়। খগরাজবিনিন্দিত সুন্দর নাসিকা, পাতলা অথচ ক্ষুদ্র কর্ণ দুটী, ভ্রমরকৃষ্ণ যুগ্ম ভ্রূ, শুভ্র বর্ণ, উজ্জ্বল মুক্তাবলীর মত দন্তশ্রেণী, নিবিড় কাদম্বিনী সদৃশ সুবিস্তৃত সুচিক্কণ ও সুকুঞ্চিত কেশরাশি। সেই কেশরাশি যখন এলায়িত থাকে, তাহা কপোল, বাহু, পৃষ্ঠ ও নিতম্বদেশে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এ সৌন্দর্য্যপ্রতিমার শোভা অতুলনীয়া, সে অনির্ব্বচনীয় সরল মুখখানিতে বালিকার সমগ্র প্রকৃতিখানি খোলা রহিয়াছে। অঙ্গে আভরণ অতি সামান্য। নাসিকায় সামান্য একটী মুক্তা ঝুলিতেছে, কর্ণে সুবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

দুইটী কৃত্রিম পুষ্প, মণিবন্ধে দুইগাছি নীলবর্ণ কাচের চুড়ী। ইহাতে সৌন্দর্য্য যেন আরও শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই সুবর্ণবিনিন্দিত অঙ্গের নিকট আপনার গৌরব হ্রাস হইবে ভাবিয়া আতঙ্কে সুবর্ণ যেন সে অঙ্গে উঠিতে সাহস পায় নাই।

বালিকার নাম শোভা। পূজার বন্ধে দাদা গৃহে আসিয়াছেন, শোভার আনন্দ দেখে কে? সুরেশচন্দ্র যে দিন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, শোভা দৌড়াইয়া আসিয়া সুরেশের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "দাদা, আমার জন্যে কি এনেচ?" পরে দাদার পশ্চাতে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া, কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া দুই পদ পশ্চাৎ হটিয়া আসিল। ভূপেন্দ্রনাথের প্রাণে সেই মুহূর্ত্তে বিজলী খেলিয়া উঠিল।

শোভা যে এরূপে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইবে, সুরেশের তাহা জানা ছিল, তাই আসিবার সময় শোভার জন্য একখানি নূতন কাপড় ও তিনটী বন্দেমাতরম্ হেয়ার পিন আনিয়াছিলেন। তিনি সেগুলি শোভার হস্তে প্রদান করিলেন। শোভা তাহা লইয়া প্রীত হইয়া ভগ্নীগণকে দেখাইতে গেল।

জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি! দাদার সঙ্গে কে এসেছে জান"? জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ঈষৎ হাস্য ও সপরিহাস করিয়া কহিল "জানি, তোর বর"। এই কথায় শোভা বড়ই লজ্জিত হইল, এবং সেই কোমল হস্তের একটী কিল দিদির পৃষ্ঠে পতিত হইল।

ভূপেন্দ্রনাথকে দেখিয়া প্রথম প্রথম শোভা বড়ই লজ্জিত হইত, এবং সুরেশের সঙ্গে সর্ব্বদাই ভূপেন্দ্রনাথ থাকিতেন বলিয়া সুরেশের নিকটেও আসিতে ইতস্ততঃ করিত। কিন্তু বালসুলভ চপলতা বশতঃ শীঘ্রই তাহার সে ভাব দূর হইল। ভূপেন্দ্রনাথ সেই দেববালার সহিত কথা কহিয়া, তাহাকে গল্প শুনাইয়া, পাঠ বলিয়া দিয়া অপার আনন্দানুভব করিতেন।

সুরেশ বাটী আসিলেই নবীন বাবু শোভার বিবাহের কথা বলিয়া থাকেন, এবারেও বলিলেন, কিন্তু এখন শোভার বিবাহ দিতে সুরেশের আদৌ ইচ্ছা নাই। তিনি পিতাকে বুঝাইয়া কহিলেন "আমি উপার্জ্জনক্ষম হইয়া দেখিয়া শুনিয়া শোভার বিবাহ দিব, সেজন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। শোভার ন্যায় অমূল্য রত্ন অপাত্রে অর্পণ করিয়া তাহাকে অপার দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিবেন না।"

অগত্যা নবীন বাবু নিরস্ত হইলেন। তাঁহার নিজের বিবাহ দিবার ইচ্ছা থাকিলেও উপযুক্ত সৎপুত্রের পরামর্শের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটী ফুরাইয়া গেল। সুরেশচন্দ্র পিতামাতার চরণবন্দনান্তে তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় কলিকাতায় চলিলেন। ভূপেন্দ্রও বিদায়গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় ধনীর সন্তানের এরূপ অমায়িকতা দেখিয়া

সুরেশের আত্মীয়বর্গ একেবারে বিমোহিত হইয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রের বিরহে সকলেই কাতর হইলেন। ভূপেন্দ্র মিষ্ট ব্যবহারে সকলেরই শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথকে আবার বর্দ্ধমানে আসিবার নিমিত্ত সুরেশের মাতা অনেক অনুরোধ করিলেন। ভূপেন্দ্রও সম্মতি জানাইলেন।

নবীন বাবু সাশ্রুনয়নে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। শোভা মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল, দাদার জন্য তাহার বড়ই মন কেমন করিতে লাগিল, আবার কে জানে কেন দাদার বন্ধুর জন্যও তাহার বড় মন কেমন করিতে লাগিল। শোভা মনে ভাবিতে লাগিল "উনিতো আমাদের কেহই নন, কেবল দাদার বন্ধু. তবে তাঁহার জন্য আমার এত মন কেমন করে কেন?"

কিন্তু বালিকা এ ''কেন"র উত্তর দানে সক্ষম হইল না। ভাবিয়া ভাবিয়া সে কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইল না, কিন্তু বড়ই কাতর হইল। তাহার আর খেলাধুলা ভাল লাগে না, ছুটাছুটী ভাল লাগে না, খেলাঘরের হাঁড়ি বেড়ি আর সে স্পর্শ করে না, পুতুলগুলি বাক্সমধ্যে চাবিবদ্ধ হইয়া রহিল।

বালিকা অন্যমনে উদাসপ্রাণে কি জানি কিসের চিন্তায় সর্ব্বদা মগ্ন থাকে। কয়েক দিন পরে শোভা ভূপেন্দ্রের লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পত্র পাইল। পাঠিকাগণ মনে করিতে পারেন এত লোক থাকিতে শোভাকে পত্র কেন? তাই তাঁহাদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কলিকাতা,

স্নেহের শোভা! ৬ই কার্ত্তিক।

আমরা নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি ও ভাল আছি। তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়া সর্ব্বদাই বড় মন কেমন করিতেছে। জানি না, আবার কবে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে! আমার অশান্তিময় জীবন তোমাদের কাছে বড়ই শান্তিতে ছিল। তুমি আমার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ জানিবে। পিতামাতা ও ভগ্নীগণকে আমার প্রণাম জানাইবে। তোমার দাদা ভাল আছেন। ইতি

তোমার শুভার্থী
ভূপেন্দ্রনাথ।

শোভা পত্রখানি পাঠ করিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

ভুত না মানুষ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নন্দকের দুরবস্থা।

প্রায় চারি দণ্ড বেলার সময় নন্দক চণ্ডদেবের গৃহাঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলেন। তৎকালে নবীন অর্কের কিরণসম্পাতে প্রভাত প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি উথলিয়া উঠিতেছিল। তখনও পর্য্যন্ত তপনদেব আপনার তেজ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কেবল পূর্ব্ব আকাশে উদিত হইয়া চক্ চক্ করিতেছিলেন।

নন্দক চণ্ডদেবের শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভিতর হইতে শয়নকক্ষের দ্বার বদ্ধ ছিল। এই অবসরে নন্দক ক্ষণকাল তথায় অবনত মস্তকে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার চিন্তার স্রোত শুধু চণ্ডদেবের সেই হস্তের ক্ষতের উপরেই পতিত ছিল। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন এ ক্ষতটী কিসের ক্ষত। যৎকালে নন্দক চন্দনীর অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া, সেই দিকে ধাবিত হইতেছিলেন, তৎকালে তাহার উন্মুক্ত অসি এক জন অশ্বারোহীকে আঘাত করিয়াছিল। নন্দক আজও পর্য্যন্ত তাহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন, "তবে কি সেই অশ্বারোহী চণ্ডদেব?" সত্য সত্যই কি চণ্ডদেব চন্দনীকে হত্যা করিয়াছে? হঠাৎ নন্দকের আপাদমস্তক ঘর্ম্মজলে সিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে তিনি সংযত হইয়া ভাবিলেন, "না তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়? আমি ত গমনকালে তাঁহার নিকটে বিদায় লইয়া গিয়াছিলাম। এই কালের মধ্যে তিনি কিরূপে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন? আবার ভাবিলেন হাঁ তাহা হইতেও পারে। হয়ত আমি যে উপায়ে সেখানে গিয়েছিলাম, তিনিও সেই উপায়েই সেইখানে গমন করিয়াছিলেন।" নন্দক এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, সহসা গৃহাভ্যন্তরে মানুষের পদসঞ্চারের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। "একি!" বলিয়া নন্দক লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল ও নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি প্রাণপণে দ্বার মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তদ্দণ্ডেই তিনি ভৃত্যবর্গকে লৌহদ্বার ভগ্ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ভৃত্যেরা লৌহদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা সেই দ্বারের উপরে পুনঃপুনঃ অস্ত্রাঘাত করিল, এবং লৌহময় কবাট

ঝন্ ঝন্ শব্দে পুনঃপুনঃ সেই আঘাতের প্রত্যুত্তর দিল। কিন্তু শীঘ্র যে তাহা ভগ্ন হইবে এমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ক্রমে ক্রমে নন্দক ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে আজ্ঞা করিলেন, "দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেল।"

যখন পাঁচজন ভৃত্য পাঁচখানি হাতিয়ার লইয়া সম্মুখস্থ দেওয়াল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল, তখন সহসা ঘরের দরজা মুক্ত হইল। ঘর হইতে এক বিকটাকার জীব বাহির হইয়া যতদূর সম্ভব দ্রুত-গতিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। এতাদৃশ ভীষণ আকৃতি দর্শনে ভৃত্যগণ চমকিয়া ও শিহরিয়া উঠিল। তাহার পরক্ষণেই তাহারা ভয়ে মৃতবৎ হইয়া পড়িল।

চণ্ডদেবের পূজার গৃহে সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সেই মৃতদেহ চণ্ডদেব অনুপস্থিত থাকাতে তিন দিন ঘরের মধ্যে বদ্ধ ছিল। তজ্জন্যই গৃহের সমুদায় লোক অতিশয় শঙ্কিতভাবে এ গৃহে বাস করিত, এবং সামান্য কারণেই ভীত হইত।

কিন্তু নন্দক বিচলিত হইলেন না। গৃহদ্বার মুক্ত পাইয়া তিনি পলকমধ্যে গৃহা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন চণ্ডদেব মেজের উপরে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। নন্দক সেই মুহূর্ত্তেই ঝড়ের মত ছুটিয়া সেই জীবাকৃতি ভূত অথবা ভূতাকৃতি জীবটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। গমনকালে ভৃত্যদিগকে বলিয়া গেলেন "ইঁহাকে শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাও, ভয় নাই"।

ভৃত্যগণ নন্দকের ইঙ্গিতানুসারে চণ্ড-দেবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

পাঠিকাগণ! এই অবসরে একবার যদি সেই কিম্ভুতকিমাকার জীবটীর রূপ বর্ণনা শুনিতে চান, তবে আমার সঙ্গে আসুন। আজ যে জীবটী চণ্ডদেবের এরূপ অবস্থা করিয়া পলাইল, তাহাকে দেখিলে পৃথিবীর জীব বলিয়া উপলব্ধি করা কঠিন। তাহার মস্তক অতি প্রকাণ্ড, বদন বিস্ফারিত, জিহ্বা, চক্ষু সমুদায়ই প্রকাণ্ড। চক্ষু প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু তাহাতে পলক নাই, দৃষ্টি নাই। তাহার পশ্চাতে প্রকাণ্ড একটী লাঙ্গুল, ও তাহা দ্বারা সমস্ত শরীর জড়িত। পৃষ্ঠের দুই দিকে দুইখানি প্রকাণ্ড পাখা রহিয়াছে। শরীরটাকে শরীর বলিয়া বুঝা যায় না, বোধ হয় যেন অমাবস্যার অন্ধকারের একটী উচুনীচু স্তূপ বায়ু-বেগে চলিতেছে। কিন্তু সে যখন বন-পথ ধরিয়া চলিতেছিল, তাহাই মানুষের সৌভাগ্যের বিষয়, নচেৎ ইহা যাহার নেত্রপথে পতিত হইত, সেই ভীত ও চকিত হইত। ইহার নাম যে কি, তাহা আমরা এখন পর্য্যন্তও অবগত হইতে পারি নাই। অতএব আমরা তাহাকে ভূত বলিয়াই উল্লেখ করিব। ভূত বনপথ দিয়া চলিয়াছে; ভূত চলিয়াছে, তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ভূত প্রাণপণে চলিয়াছে। উড়িবার সময় তাহার পাখা

পাখীর ন্যায়ই সঞ্চালিত হইতেছিল, এবং গমনকালে লেজটী কখন কখন আস্তে আস্তে দেহকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল, কখন কখন পুনরায় দেহকে জড়াইয়া ধরিয়া পূর্ব্ববৎ রাখিতেছিল। ভূত চলিতে চলিতে কখন খসিতেছিল, কখন শুইয়া পড়িতেছিল এবং কখন কখন নিবিড় বনের মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছিল। আবার তথা হইতে বহির্গত হইয়া উড়িতে লাগিল। ভূত চলিল, সঙ্গে সঙ্গে নন্দকও চলিলেন।

ভূত সহসা অদৃশ্য হইল, নন্দক আর তাহাকে দেখিতে না পাইয়া একটী বটবৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নিদ্রা তাঁহাকে ভাবনা, শোক ও দুঃখের অতীত একটী রাজ্যে লইয়া গেল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, নন্দক জাগ্রত হইয়াই সম্মুখে নানাবিধ ভোজনোপযোগী ফলমূল দেখিতে পাইলেন। এ সব কোথা হইতে আসিল এবং আহার করা উচিত কি অনুচিত, তাহা আর তাঁহার বিবেচনা করিবার সময় হইল না। তিনি ভূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে, দৃষ্টিমাত্রই ফলগুলি উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র নদী কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি তাহা হইতে জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহাকে বেশ সুস্থ দেখাইতে লাগিল এবং তিনি পুনর্ব্বার গমনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঠিক সেই সময়েই ভূতও পুনরায় বাহির হইয়া নন্দকের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। পক্ষপুটে তাহার সমস্ত শরীর আবরিত ছিল। পশ্চাৎ হইতে নন্দক স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলেন যে, ভূত মাটীর উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। নন্দক ভূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। উভয়েই চলিলেন, কাহারও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ভূত কখন দক্ষিণে, কখন বামে, কখন মহাবেগে, কখন মৃদুবেগে যাইতেছে। কিন্তু মহাবুদ্ধিমান্, মহাতেজস্বী, মহাকৌশলী ও সাহসী নন্দক ধরি ধরি করিয়াও ভূতকে ধরিতে পারিতেছিলেন না। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন তাহারা একটী উচ্চ পাহাড়ের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নন্দক বলিষ্ঠ যুবক হইয়াও তৎকালে একটু বিরক্তি ও ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার গতি কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ভূত ধীরে ধীরে উচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিয়া পড়িল, নন্দক পাহাড়ের পাদদেশে পড়িয়া রহিলেন। তৎকালে অন্ধকারের সীমা পরিসীমা ছিল না এবং অন্ধকারের কালগর্ভে মা বসুমতী ক্রমে ক্রমে লুক্কায়িতা হইতেছিলেন। কিন্তু ঘন ঘটার মধ্য হইতে যে বিদ্যুচ্ছটা চমকিত হইতেছিল, তদ্দর্শনেই তাহারা দিঙ্ নির্ণয় করিতেছিল।

ভূত পাহাড়ের উপর উঠিল দেখিয়া নন্দকের চৈতন্যোদয় হইল, এবং বিষম অনুতাপ ও লজ্জায় তিনি বসিয়া পড়িয়া নিজে নিজেকে ধিক্কার দিয়া কহিলেন, "আমাকে ধিক্ যে আজ আমাকে সারাটা দিনই একটী ক্ষীণজীবী ভূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে হইল। সমস্ত দিনের মধ্যেও আমি তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। উপরন্তু, সেই আমাকে অতিক্রম করিয়া গেল। অথবা আমি ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ তাহাকে ধরি নাই। এই গভীর বনমধ্যে একাকী একটা ভূতকে আক্রমণ করিতে হয় ত আমি ভীত হইতেছিলাম, হয়ত সেই জন্যই ধরি-ধরি করিয়াই ধরিতে পারিতেছিলাম না। সে যাহা হোক্, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই দুষ্ট ভূতের গমনের সীমা কতদূর তাহা আমি দেখিব।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে পাহাড়ের উপরে উঠিতে লাগিলেন। অনেক দূর উঠিলেন, কিন্তু ভূতের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পাহাড়ের উপরে উঠিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানেও ভূতকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল ধবল-বসন-পরিহিত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। মনুষ্যমূর্ত্তি যে স্থানে বসিয়াছিল, তাহার নিম্নেই একটী সমুদ্রবৎ গর্ত্ত। নন্দক দেখিলেন ভূত যদি আর একপদও অগ্রসর হয়, তাঁহা হইলে সেই সমুদ্রে পতিত হইবে। নন্দক বুঝিলেন সে স্থানে পড়িলে ভূত হোক্, মানুষ হোক্, দেব বা দানব যাহাই হোক্, কাহারও নিস্তার নাই, এককালে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে হইবে। নন্দক আরও দেখিলেন যে, সেই ভীষণাকৃতি গহ্বরের ভিতর স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড পর্ব্বতপ্রমাণ এক একটী বালুকাস্তূপ রহিয়াছে এবং এই স্তূপের একটী এই পাহাড়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। নন্দক তখন উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় হইয়াছেন। মৃত্যুর ভয় ও জীবনের বাসনা তাঁহাকে ভীত বা বিস্মিত করিতে সমর্থ হইল না। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই ভূতকে ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মনুষ্যমূর্ত্তিটী শীলাবৎ অচল অবস্থায় উপবিষ্ট রহিল, পলাইবার কিম্বা আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টা করিল না। নন্দক মহাবলে মনুষ্যমূর্ত্তিটীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। তখন মূর্ত্তিও তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, এবং পাহাড় হইতে সেই সমুদ্রবৎ গহ্বরের দিকে নিপতিত হইল।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় নন্দক বিচলিত হইলেন এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিলেন যে, তাহার জীবনের এইখানেই শেষ।

তখন বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, আকাশে ঘন ঘটার চিহ্নমাত্র নাই। মধুর বাতাসে ছোট বড় লতা ও পত্রগুলি নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছিল। এই আশ্চর্য্য কার্য্যকারণময় পৃথিবীর কি বিচিত্র রচনাকৌশল! ঊর্দ্ধে অসংখ্যজ্যোতিষ্কমণ্ডিত

গগনমণ্ডল, নিয়ে অসংখ্য-পুষ্প-পরিপূর্ণ অসীম বন, উত্তালতরঙ্গময় মহাসাগর, অভ্রভেদী তুষারধবল গিরিশ্রেণী, কখন অমাবস্যার অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়, আবার কখনও পূর্ণিমার আলোকে আলোকিত হয়।

(ক্রমশঃ)

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

ভারতে রেশম-শিল্প।

রেশম-শিল্প ভারতের অতি প্রাচীন ও অর্থকর শিল্প। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে আমরা রেশম অথবা উর্ণবস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই বস্ত্র অতিশয় শুদ্ধ ও পবিত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং প্রাচীন ধর্মপরায়ণ হিন্দুগণ কোন পবিত্র অনুষ্ঠানাদির সময় এই রেশমবস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ইহা পূর্ব্বে বহুমূল্য বস্ত্রের মধ্যে গণনীয় হইত এবং রাজা, জমিদার প্রভৃতি সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণই এই বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণগণও যজমানদিগের নিকট পাইয়া এই সকল বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকম্পায় রেশমবস্ত্র বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখন নীচ ও উচ্চ সকলেরই রেশমের একখানি চাদর না হইলে চলে না। আজকাল অবস্থানুসারে ধনী ও দরিদ্র উভয়েই রেশমের চাদর ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বস্তুগত অনেক পার্থক্য আছে। ইহা হইতে দেখা যে, রেশমের বস্ত্রের নিশ্চয়ই এরূপ কোন গুণ আছে, যাহার জন্য ধনী দরিদ্র সকলেই সমভাবে তাহার সমাদর করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা কার্পাসবস্ত্র অপেক্ষা প্রায় ৮।১০ আট দশ গুণ অধিক স্থায়ী হয়। যেখানে কার্পাসবস্ত্র এক বৎসর যায়, রেশমের বস্ত্র সেখানে ৮ বৎসর যাইবে। কার্পাসবস্ত্রের ন্যায় ইহা শীঘ্র অপরিষ্কার হয় না এবং মলিন হইলেও কর্পাসবস্ত্রাপেক্ষা অনায়াসেই তাহা স্বহস্তেই পরিষ্কার করা যায়। অধিকন্তু ইহা ব্যবহারে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা দৃষ্ট হয়। এই শিল্প কতকাল হইতে যে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কেহ ঠিক নির্ণয় করিতে পারেন না। প্রবাদ আছে যে, এই শিল্প পূর্ব্বকালে ভারতের উত্তরপূর্ব্বস্থিত চিন দেশেই কেবলমাত্র প্রচলিত ছিল। চীনদেশের কোন রাজ্ঞী এক দিন নিজ উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পান যে, একটী গাছে একটী কীট নিজ মুখ হইতে সূত্র নিঃসৃত করিয়া তাহার দ্বারা তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। তিনি বিস্ময়াম্বিত হইয়া উক্ত সূত্র নিষ্ক্রামণ করিয়া দেখিলেন যে, তাহা অতি শক্ত এবং ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট

এবং তাহা হইতে বেশ সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। তৎক্ষণাৎ তিনি অনেক অনুসন্ধানপূর্ব্বক সেইরূপ সূত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। যে কীটের মুখ হইতে সূত্র নিঃসৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে রীতিমত আহারাদি দানে গৃহে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাও প্রচার করিলেন যে, তাঁহার দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য কেহ এই রেশমসূত্রের বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না এবং এই কীটের বীজ তাঁহার রাজ্য হইতে যে কেহ অন্য কোন রাজ্যে লইয়া যাইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিছুকাল পরে ভারতের হিমালয়প্রান্তবর্ত্তী কোন প্রদেশের নৃপতির সহিত উক্ত রাজ্ঞীর একমাত্র কন্যার বিবাহ হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশ্মীরপ্রদেশেই উক্ত রাজকুমারীর বিবাহ হয়, কেননা এক্ষণে ভারতের মধ্যে কাশ্মীরই রেশমশিল্পে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। উক্ত রাজকুমারী যখন বিবাহের পর স্বামিগৃহে আগমন করেন, তখন তিনি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া গোপনে ঐ রেশমকীটের কিছু বীজ সংগ্রহ করিয়া পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে তাহা শ্বশুরগৃহে লইয়া আসেন এবং সেখানে গোপনে রেশমসূত্র দ্বারা নিজ ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রাদি বয়ন করান। কিন্তু এ সংবাদ চীনসাম্রাজ্ঞীর নিকট অধিক দিন লুক্কায়িত রহিল না। একদিন ঘটনাক্রমে একখণ্ড রেশমের বস্ত্রে কোন দ্রব্য বাঁধিয়া রাজকুমারী তাঁহার মাতার নিকট পাঠান। রাজ্ঞী তাহা হইতে বুঝিলেন যে, রাজকুমারী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া রেশমকীটের বীজ অন্যত্র লইয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার কন্যা ও জামাতার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা প্রদান করিয়া একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজকুমারী এই সংবাদ পাইবামাত্রই এক ভৃত্য সমভিব্যাহারে রেশমকীটের সঞ্চিত বীজ সঙ্গে লইয়া নিজ সাম্রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গভীর অরণ্যে প্রস্থান করেন। বলা বাহুল্য যে, ক্রোধান্বিতা চীনরাজ্ঞীর আদেশে চীনসৈন্য কর্ত্তৃক কাশ্মীররাজ্য সমতলীভূত হইয়াছিল এবং রাজকুমারী ও সেই ভৃত্য ব্যতীত আর সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সঙ্গে যে অলঙ্কারাদি ছিল, তদ্দ্বারা রাজকুমারী ভৃত্যের সাহায্যে কিছু দিন চালাইলেন। পরে গ্রাসাচ্ছাদনের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার সেই রেশমকীট পালন করিয়া তাহা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে ও উক্ত ভৃত্যের সাহায্যে তাহা বড় বড় রাজপরিবারের মধ্যে প্রেরণ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। কথিত আছে যে, এই প্রকারে ভারতবর্ষে রেশমশিল্পের প্রচার হয়, কিন্তু ইহার সত্যাসত্য বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা অনেকটা ঠাকুরমার গল্পের ন্যায় বোধ হয়।

ইউরোপে এবং অন্যান্য দেশে এই শিল্পের প্রচার সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায়। কয়েক-জন ইউরোপের খৃষ্টান পাদ্রী চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন। তথায় এই নূতন শিল্পের প্রচার দেখিয়া স্বদেশে এই শিল্প প্রচার করিতে পারিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে, এই বিবেচনায় তাঁহারা সেই কীট নিজদেশে লইয়া যাইবার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তাঁহারা তিন জনে তিনটী ফাঁপা যষ্টি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গুপ্তভাবে উক্ত কীটের ডিম্ব লুকাইয়া লইয়া অতি কষ্টে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা এইরূপে নিজ দেশে উক্ত শিল্প সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে ইউরোপ রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে।

অন্যান্য সকল প্রকার বিবরণী হইতেও জানা যায় যে, রেশমশিল্পের উৎপত্তি-স্থান চীনদেশ। তথা হইতে জাপান, ভারত, তুরস্ক, ফ্রান্স, ইটালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি নানা দেশে এই শিল্প বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভারতে এই শিল্পের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে রেশমবস্ত্রের উল্লেখই যথেষ্ট প্রমাণ।

এই রেশমশিল্প এক্ষণে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশদেশা-ন্তরে অল্প বিস্তর ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উত্তরে কাশ্মীর, উত্তর পশ্চিমে বেনারস, বঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী, বীরভূম, বাঁকুড়া, আসামে গৌহাটী, মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সকল স্থানেই এই শিল্পের বিশেষ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। রেশম ও পশমের মধ্যে প্রভেদ অনেক। পশম চতুষ্পদ জন্তুবিশেষের লোম হইতে উৎপন্ন, রেশম কীটের লালা হইতে প্রস্তুত। রেশমের কীট হইতে রেশমের চাষ ও কিরূপে রেশম উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রেশমব্যবসায়ীরা রেশমের রীতিমত চাষ করিয়া থাকেন। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, রেশমের আবার চাষ কিরূপে হয়! রেশমব্যবসায় প্রধানতঃ তিন বিভাগে বিভক্ত (১) রেশমের কোয়া উৎপন্ন করা; (২) কোয়া হইতে রেশমসূত্র প্রস্তুত করা; এবং (৩) সূত্র দ্বারা বস্ত্র বয়নাদি। এই ত্রিবিধ কার্য্য সচরাচর তিন শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। এক শ্রেণীর লোক কেবল কোয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কেবল রেশমের সূতা, তৃতীয় শ্রেণীর লোক কেবল সূতা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করে। কোন কোন স্থলে একাধিক কার্য্য একই ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(১) রেশমের কোয়া উৎপন্ন করা— রেশম-কীট নানাজাতীয়, কিন্তু তাহাদের পালন প্রণালী সকল স্থানেই প্রায় একই-রূপ। রেশমকীটের মধ্যে কতকগুলি বাৎসরিক অর্থাৎ বৎসরে একবার, কতক-গুলি যাণ্মাসিক অর্থাৎ বৎসরে দুইবার, এবং কতকগুলি ত্রৈমাসিক অর্থাৎ বৎসরে তিন

বার ডিম্ব প্রসব করে। আবার কতকগুলি বৎসরের মধ্যে বহুবারও ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

রেশমকীট ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয়, এই ডিম্ব আবার রেশমের কোয়া হইতে প্রজাপতিরূপে যে কীট বাহির হয়, তাহা হইতে পাওয়া যায়। কোয়া-ব্যবসায়ীরা অনেক সময় কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইলে তাহার ডিম্ব সংগ্রহ করে এবং কখন কখন কোয়া না লইয়া কেবল ডিম্বই সংগ্রহ করে। ডিম্ব-সংগ্রহের পূর্ব্বে তুঁত গাছের আবাদ করিতে হয়। ইহা প্রায়ই ছোট ছোট গাছ আনিয়া চাষ করা হয়। বড় বড় তুঁতের গাছও অনেক দেখা যায়।

ভারতে যে কয় জাতীয় রেশম-কীট দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বিলাতি পলু (B. Mori), বড় পলু (B. Textor), নিস্তারী বা মান্দ্রাজী পলু (B. Crœsi), দেশী বা ছোট পলু (B. Fortunatus), চীনা পলু (B. Senisis)ই প্রধান। এই কয় জাতীয় পলুর চাষই ভারতে হইয়া থাকে। এই সকল পলু তুঁত গাছের পাতা খাইয়া কোয়া প্রস্তুত করে, এই কোয়ার রেশম হইতে গরদ প্রস্তুত হয়।

এতদ্ভিন্ন তসর, এণ্ডি, ও মুগা জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রেশমের পোকা আছে। তাহাদের কোয়া হইতে তসর, এণ্ডি ও মুগার কাপড় প্রস্তুত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ইহাদের অল্প বিস্তর চায হয়।

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দুই প্রকার রেশমের কীট পালন করা হয়। নিস্তারী ও ছোট পলু এই দুই জাতীয় কীট পালনে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না এবং অতি অল্প যত্নেই ইহারা কোয়া প্রস্তুত করে।

উক্ত জাতীয় কীটের ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া চাষীরা বংশনির্ম্মিত ডালায় বিস্তৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। ডিম পাড়িবার ৮।১০ দিন পরে উক্ত ডিম হইতে ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকারের ছোট ছোট পোকা বাহির হইয়া ডিম্বের খোলার উপর বসিয়া থাকে। ইহাকে ডিম মুখান বলে। এই ডিম সকল প্রায়ই সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৯।১০টা পর্য্যন্ত মুখায়, গরমে ও শীতে এই সময়ের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। শীতকালে সচরাচর কিছু অধিক সময় পর্য্যন্ত ডিম মুখায়। সকালে ডিম মুখাইবার সময় উত্তীর্ণ হইলে নরম তুঁতের পাতা খুব মিহি করিয়া কুচাইয়া সেই মুখান পোকার উপর অল্প অল্প করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত মুখান পোকা ঐ পাতের উপর উঠিয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করে। সেই সময় খুব নরম ব্রুষ কিম্বা পালক দ্বারা সেই পাতাসমেত পোকা গুলিকে ঝাড়িয়া একটী কাগজের উপর সংগ্রহ করিতে হয় এবং বেশ সমান করিয়া একটী গোলাকার চাক বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

এই ভাবে রাখিয়া দিনের মধ্যে ৫।৬ বার পাতা কুচাইয়া ইহাদিগকে খাওয়াইতে হয়। এইরূপ ৪।৫ দিন খাওয়াইবার পর ইহাদের প্রথম খোসা ছাড়িবার সময়